দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

বামপন্থীদের কুনাট্য-রঙ্গে লোক মজলো না অঙ্গে আর বঙ্গে— পৃঃ ১৩

পশ্চিমবঙ্গ কি রাষ্ট্রপতি শাসনের দিকে এগিয়ে চলেছে?— পৃঃ ১৫

৭৩ বর্ষ, ১২ সংখ্যা।। ১৬ নভেম্বর ২০২০।। ৩০ কার্তিক - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com



জীবনের উৎসব

ভাইফোঁটা

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ১২ সংখ্যা, ৩০ কার্তিক, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

১৬ নভেম্বর - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৩

প্রসঙ্গ লোকাল ট্রেন : বিলম্বে রাজ্য সরকারের বোধোদয়
▯ রামানুজ গোস্বামী ▯ ৪

জীবনের উৎসব ভাইফোঁটা ▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ৬

ভাইফোঁটার অর্থ যুদ্ধ-চারণা, হিন্দু পুরুষকে বীর-তিলক কেটে দেওয়া ▯ কল্যাণ গৌতম ▯ ৮

ভাই-বোনের চিরন্তন সম্পর্কের উৎসব ভাইফোঁটা
▯ ধীরেন দেবনাথ ▯ ১০

ভাইফোঁটা— একটি অনিন্দ্যসুন্দর উৎসব
▯ সুতপা বসাক ভড় ▯ ১২

বামপন্থী কুনাট্য রঙ্গে লোক মজলো না অঙ্গে আর বঙ্গে
▯ বিশ্বামিত্রের কলম ▯ ১৩

পশ্চিমবঙ্গ কি রাষ্ট্রপতি শাসনের দিকে এগিয়ে চলেছে?
▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা ▯ ১৫

মোদীজীর সংকল্প দেশকে আরও শক্তিশালী করবে
▯ ডা: আর এন দাস ▯ ১৮

প্রধানমন্ত্রী মোদীর বহুবিধ সংস্কার কর্মগুলি অবশ্যই প্রশংসনীয়
▯ অরবিন্দ পানাগড়িয়া ▯ ২১

বাংলাদেশে হিন্দুদের সামনে নতুন বিপদ, দেশত্যাগের নির্দেশ ▯ ২৩

ঐতিহাসিক গৌরবোজ্জ্বল ৬ ডিসেম্বর
▯ ডা: শম্ভুনাথ ধাড়া ▯ ২৫

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ : ধর্মপুরুষার্থ ও শিক্ষা
▯ ড. ইন্দুমতী কাটদরে ▯ ২৭

রাষ্ট্রঋষি দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজীর তৃতীয় পন্থা এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে তার প্রাসঙ্গিকতা ▯ ড. তরুণ মজুমদার ▯ ২৯

বাংলা গণমাধ্যম ও বামমার্গী বুদ্ধিজীবীদের অশুভ আঁতাত
▯ বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায় ▯ ৩১

ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের চক্রান্তে বিস্মৃত রাধানাথ
▯ শুক্লা সিকদার ▯ ৩৩

ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ধর্মান্ধতা কেন?
▯ ড. নারায়ণ চক্রবর্তী ▯ ৩৫

মুঘলদের অহোম বিজয়ের স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ করেন সেনাপতি লচিত বরফুকন ▯ অনুপ ঘোষ ▯ ৩৮

আমার আদর্শ ও প্রেরণার উৎস ড. তুষারকান্তি ঘোষ
▯ শ্যামল পাল ▯ ৩৯

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভাইফোঁটা ভগিনীদের রক্ষার অঙ্গীকারের উৎসব হউক

ভারতবর্ষে ভ্রাতা-ভগিনীর সম্পর্কটি সবচাইতে পবিত্র। শুধু সহোদর-সহোদরা বা তুতো ভ্রাতা-ভগিনীই নয়, রক্তের সম্পর্ক বিহীন যেকোনো ভ্রাতা-ভগিনীর সম্পর্কই বড়ো মধুর ও চিরন্তন। এই চিরন্তন, পবিত্র ও মধুর ভাবটি ভারতবর্ষে প্রবহমান রাখিবার জন্য যুগদ্রষ্ট্রা ঋষিকুল ইহাকে উৎসবের রূপ প্রদান করিয়াছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে এই উৎসব বিভিন্ন নামে প্রচলিত। বঙ্গদেশে ইহা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা নামে অভিহিত। অঞ্চল বিশেষে ভগিনীকুল ভ্রাতৃললাটে বিভিন্ন মন্ত্রে তিলকদান করিয়া তাহাদের মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া থাকেন। ইহার ফলে পবিত্র সম্পর্ক উত্তরোত্তর পবিত্র হইতে থাকে। পৌরাণিক কাহিনি বা ব্যাখ্যা যাহাই হউক না কেন বর্তমানে এই উৎসব পরিবারের গণ্ডী ছাড়িয়া সামাজিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই উৎসবে পারিবারিক সম্পর্ক যেমন দৃঢ় হয়, অপরদিকে প্রতিষ্ঠিত হয় ভগিনীকুলের সামাজিক সম্মান।

ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোথাও নারীজাতির প্রতি মাতৃভাব বা ভগিনীভাবের বড়োই অভাব। পাশ্চাত্যদেশে ইহার অভাব স্বামী বিবেকানন্দকে ব্যথিত করিয়াছিল। ভারতবর্ষের এই পবিত্র ভাবকে বিশ্বব্যাপী করিবার মানসেই বোধ হয় স্বামীজী চিকাগোর ধর্মসভার প্রথমদিনটিতে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়াছিলেন 'আমার আমেরিকার প্রিয় ভগিনী ও ভ্রাতৃমণ্ডলী' বলিয়া। এই সম্বোধনেই তিনি বিশ্ব বিজয় করিয়াছিলেন। তিনি বিপরীত ভাবেও সম্বোধন করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। কারণ তিনি জানিতেন পরিবারের কেন্দ্রেই নারীর অবস্থান এবং নারী বিশ্বজননীর প্রতিরূপ। ফলস্বরূপ তিনি ভগিনীরত্ন— ভগিনী নিবেদিতাকে ভারত কল্যাণে ভারতকন্যা রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা বিদেশিনী হইয়াও সেইযুগের ভারতীয় নারীকুলের পবিত্রতা, নিঃস্বার্থপরতা ও অতুলনীয় মাতৃহৃদয়ের সন্ধান পাইয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। জগদ্‌বাসীর নিকট ভারতীয় নারীর এই মহিমময় ঐতিহ্যকে তিনি তাঁর লেখনীর দ্বারা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

অতীব দুঃখের বিষয় যে, বর্তমানে দেশে ভগিনীদের উপর নানাবিধ অত্যাচার ও লাঞ্ছনার ঘটনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভগিনীরা আজ নিরাপত্তার অভাব বোধ করিতেছে। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও ইহা ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। প্রতিবেশী দেশে ভগিনীদের অবমাননা চরম অবস্থায় পৌঁছাইয়াছে বিধর্মী নরপশুদের দ্বারা। এমতাবস্থায় ভাইফোঁটার মতো পবিত্র অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচলন আবশ্যক। ভগিনীদের পবিত্রতাই ভ্রাতৃকুলের শক্তির উৎস। পশুসত্তাকে শরীর ও মনের ঊর্ধ্বে লইয়া যাওয়াই হইল পবিত্রতা। এই পবিত্রতাই মানুষের চিন্তা, বাক্য ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া থাকে। ইহার ফলেই কোনো পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হইয়া নিজ স্ত্রী ব্যতীত অপর সকল নারীই ভগিনী অথবা মাতৃসদৃশ হইয়া থাকে। নারী জাতির ভগিনী হইয়া উঠিবার উৎসবই ভাইফোঁটা। ভারতবর্ষের গ্রামে-শহরে, পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হউক সার্বজনিক ভাবে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান। ভগিনীকুলের রক্ষার অঙ্গীকার গ্রহণ করুক ভ্রাতৃকুল।

সুভাষিতম্

যস্মিন্ রুষ্টে ভয়ং নাস্তি তুষ্টে নৈব ধনাগমঃ।
নিগ্রহানুগ্রহৌ ন স্তঃ স রুষ্টঃ কিং করিষ্যতি।।

যে ক্রুদ্ধ হলে কেউ ভয় পায় না, সন্তুষ্ট হলে ধনাগম হয় না, যার কোনো অভিশাপ নেই, আশীর্বাদ নেই, সে রুষ্ট হয়ে কী করবে?

প্রসঙ্গ লোকাল ট্রেন ঃ বিলম্বে রাজ্য সরকারের বোধোদয়

রামানুজ গোস্বামী

অবশেষে কোটি কোটি সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, দরিদ্র তথা শ্রমজীবী পশ্চিমবঙ্গবাসীকে স্বস্তি দিয়ে প্রায় আট মাস পর গত ১১ নভেম্বর, বুধবার থেকে এই রাজ্যে লোকাল ট্রেন চলাচল পুনরায় শুরু হয়েছে। সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাপী অতিমারীর কবলে মানবসমাজ এবং এই কারণেই লোকাল ট্রেনের প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে যাতে সংক্রমণ বেড়ে না যায়, সেই জন্যই ভয়ানক আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও ভারত সরকার লোকাল ট্রেন চালানো বন্ধ করে দেন। তারপরে কেটে গিয়েছে অনেকটা সময়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারত আজ সফলতার সঙ্গে বহু উন্নত দেশকে পিছনে ফেলে এই অতিমারীর মোকাবিলা করে চলেছে। তাই ভারতে মৃত্যুর হার সারা বিশ্বে প্রায় সর্বনিম্ন এবং সুস্থতার হার প্রায় সর্বোচ্চ। বিগত কয়েক মাস ধরেই ভারতের এই ক্রমোন্নতি সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যাই হোক, ধীরে ধীরে ভারত সরকার তাই আনলকের প্রক্রিয়া শুরু করে। এই অবস্থাতেই শুরু হয় লোকাল ট্রেনের বিষয়ে পরিকল্পনা।

এবারে আসা যাক পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে। প্রথম থেকেই রাজ্য সরকার অতিমারীর বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হয়নি। তথ্য গোপন করা, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সহযোগিতা করতে না চাওয়া এবং সর্বোপরি টেস্টের সংখ্যার নিরিখেও বারে বারে অভিযুক্ত হয়েছে এই রাজ্য সরকার। উল্লেখ্য যে, এখনও রাজ্যে টেস্টের পরিমাণ (দৈনিক হিসেবে) উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, বিহার প্রভৃতি রাজ্যের তুলনায় বহু কম। তাছাড়া, লকডাউনের সময়ে রাজ্য সরকার প্রস্তুতির যে সময়টুকু পেয়েছিল, তাকেও যথার্থ ভাবে কাজে লাগায়নি। অনমনীয় মনোভাব, অকারণ ও অযৌক্তিকভাবে কেন্দ্রের বিরোধিতা, সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ ইত্যাদি কারণেই আজ এই রাজ্যে মৃত্যুর হার এত বেশি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাজ্য সরকার সমস্ত অফিস, দোকান-বাজার ইত্যাদি খুলে তো দিয়েছে— কিন্তু মানুষ কীভাবে যাতায়াত করবে আবার সামাজিক দূরত্ববিধিও কীভাবে বজায় থাকবে, তা একেবারেই ভাবেনি। এর মূলে রয়েছে যথাযোগ্য পরিকল্পনার অভাব। ফলে দেখা গেল যে, বেসরকারি বাসে ভয়ংকর ভিড় ঠেলেও লোকে কর্মস্থলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এই বিষয়ে উল্লেখ্য যে, এই রাজ্যে (বিশেষত কলকাতায়) সরকারি বাসের সংখ্যা অন্যান্য অনেক মেট্রো শহরের তুলনায় বেশ কম। ফলে সাধারণ মানুষকে নাজেহাল হয়ে যেতে হয়। অন্যদিকে, বেশ কিছু অসাধু ব্যক্তির উদ্দেশ্য সাধনও হয় এই সময়। নানা রুটে বাসে, অটোয় বেশি ভাড়া নেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। মানুষকে বাধ্য হয়েই প্রত্যহ বেশি ভাড়া দিয়েই কর্মস্থলে যেতে হয়েছে বা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতেই জোরালো হয়ে ওঠে লোকাল ট্রেন চালানোর দাবি।

ভিড়ের অজুহাতে নিছক রাজনৈতিক স্বার্থেই (কেন্দ্রের বিরোধিতা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য) রাজ্য সরকার এতদিন লোকাল ট্রেনের বিষয়ে উদাসীন ছিল। রাজ্য-প্রশাসনের উচিত, রেলের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করা। কোনও রাজনৈতিক স্বার্থ নয়, মানুষের জীবন ও জীবীকার স্বার্থেই তা করা কর্তব্য।

উল্লেখ্য যে, কলকাতায় সেপ্টেম্বর মাসেই মেট্রো রেল চালানো শুরু হয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই এতে নিত্যযাত্রীদের অনেক সুবিধা হয়েছে। কিন্তু এটা বোঝা দরকার যে, প্রতিদিন কলকাতার মেট্রোয় যে বা যত পরিমাণ যাত্রী যাতায়াত করেন, তার থেকে বহু গুণ যাত্রী লোকাল ট্রেনে প্রত্যহ যাতায়াত করেন। কিন্তু লোকাল ট্রেন না চলায় সেইসব যাত্রীর হয় প্রত্যহ বহু গুণ বেশি ভাড়া দিয়ে কলকাতায় আসতে হচ্ছিল অথবা বহু মানুষ দীর্ঘ কয়েক মাস শহরে আসাই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে যে, লোকাল ট্রেনের যাত্রীদের অধিকাংশই কিন্তু সরকারি কর্মচারী নন। নানারকম ছোটোবড়ো বেসরকারি সংস্থার চাকুরে, ছোটো ব্যবসায়ী, ফুল বিক্রেতা, ফল ও সবজি বিক্রেতা, গৃহের পরিচারিকা প্রভৃতি

নানাবিধ কাজে যুক্ত ব্যক্তিরাই প্রত্যহ দূরবর্তী স্থান থেকে কলকাতায় আসা-যাওয়া করেন এবং সেক্ষেত্রে প্রধান মাধ্যম এই লোকাল ট্রেন। এতে যেমন যাতায়াতের সময় বাঁচে, তেমনই অর্থেরও সাশ্রয় হয়। এছাড়া, হকারদের জীবন ও জীবিকারও প্রধান উপায় এই লোকাল ট্রেন। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে, সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার একমাত্র অবলম্বনই লোকাল ট্রেন। তাছাড়া, একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, চিকিৎসার প্রয়োজনেও বহু মানুষকে ট্রেনে চড়ে প্রত্যহ কলকাতায় আসতে হয়। লোকাল ট্রেন বন্ধ থাকায় এই শ্রেণীর যাত্রীরাও চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হন।

ধরা যাক, মান্থলি টিকিটে মাত্র ১০০/২০০ টাকায় কোনও যাত্রী সারামাস কলকাতায় আসা-যাওয়া করতে পারেন। কিন্তু এতদিনে বা এতমাস ধরে সেই যাত্রীকে হয়তো প্রত্যহ ২০০/৫০০ টাকা খরচ করে কলকাতায় আসা-যাওয়া করতে হয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যে, শ্রমজীবী মানুষের দৈনিক রোজগারের থেকেও বেশি টাকা প্রত্যহ যাতায়াতেই খরচ করতে হয়েছে। একে তো বহু ক্ষেত্রেই বেতনে কোপ পড়েছে (বিশেষত অসংগঠিত ক্ষেত্রে), অনেকেই কর্মহীন হয়ে পড়েছেন, তার উপরে বর্ধিত যাতায়াত-খরচে এই শ্রেণীর মানুষেরা একেবারে নাজেহাল হয়ে পড়েন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো যে, এতে কি রাজ্য সরকারের কিছুই করার ছিল না? এক্ষেত্রে, অবশ্যই যে কথা উল্লেখ করা দরকার, তা হলো এই যে, রেলমন্ত্রক দুইবার রাজ্য সরকারকে চিঠি দেয় রেল চালানোর ব্যাপারে আলোচনায় বসবার জন্য। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত ভারতের রেলমন্ত্রীকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেন লোকাল ট্রেন চালানোর জন্য। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিষয়ে আশ্চর্যজনক ভাবে নীরবতা পালন করে। রেলের কথামতো আলোচনায় বসলে নিশ্চিত ভাবেই অনেক আগেই ট্রেন চালু করা যেত এবং কোটি কোটি মানুষ উৎসবের সময় একটু রোজগার খুঁজে পেতেন। যে সকল ব্যক্তিকে প্রত্যহ, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, রাণাঘাট, কল্যাণী, কাঁচরাপাড়া, বর্ধমান, ক্যানিং, নামখানা, ডায়মন্ডহারবার প্রভৃতি জায়গা থেকে কলকাতায় যাতায়াত করতে হয় বা হয়েছে, তাদের জন্য এই রাজ্য প্রশাসন একেবারেই ভাবেনি। শুধুমাত্র কলকাতায় আসতে না পারার কারণে কত পরিবার নিদারুণ দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে বা কাটিয়েছে, তার কোনও হিসেব নেই। সারা ভারতে যখন সব কিছুই ধীরে ধীরে আনলক করা হয়েছে, সর্বত্রই সবরকম গণপরিবহণও চলছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার মানুষের কথা না ভেবে একেবারেই উদাসীন ছিল। বিজেপি-সহ একাধিক বিরোধীদল এই বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাও করেছে একাধিকবার। কিন্তু এতেও সরকারের হুঁশ ফেরেনি।

তবে, জনতা যখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, বহু স্টেশনে বিক্ষোভের ঢেউ আছড়ে পড়ল এবং সর্বশেষে হাওড়া স্টেশনে ভয়াবহ যাত্রীবিক্ষোভ সুচিত হলো, তখন এই উদাসীন রাজ্য সরকার সব দোষ রেলের উপরে চাপিয়ে দিয়ে আলোচনায় রাজি হলো। তবে, এটা ঠিক যে, সাধারণ মানুষ বুঝতে পারলেন যে, রাজ্য সরকার নয়, বরং ভারত সরকারের রেল-মন্ত্রকই বহুদিন থেকেই সাধারণ মানুষের কথা ভেবেছিল আর তাই রাজ্যকে বারে বারে আলোচনার কথাও জানিয়েছিল। এটা যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, ভিড়ে সংক্রমণের আশঙ্কা থেকে যায়, সেক্ষেত্রে প্রশ্ন এই যে, রাজ্য সরকার বাসে ভিড় নিয়ন্ত্রণের কি কোনও ব্যবস্থা করেছে? উত্তর হলো করেনি। কারণ, তা হলে তো বাসে এত ভিড়ই হতো না। বস্তুত, ভিড়ের অজুহাতে নিছক রাজনৈতিক স্বার্থেই (কেন্দ্রের বিরোধিতা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য) রাজ্য সরকার এতদিন লোকাল ট্রেনের বিষয়ে উদাসীন ছিল।

যাই হোক, লোকাল ট্রেন চলা শুরু হয়েছে। রাজ্য-প্রশাসনের উচিত, রেলের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করা। কোনও রাজনৈতিক স্বার্থ নয়, মানুষের জীবন ও জীবীকার স্বার্থেই তা করা কর্তব্য। প্রসঙ্গত, দূরপাল্লার ট্রেনের সংখ্যা কিছু কম করে, স্বল্প দূরত্বে ভাগ করে বেশি সংখ্যক ট্রেন চালিয়ে যাত্রীর ভিড়কে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। অতিমারীকে পরাজিত করে নিশ্চিত ভাবেই লোকাল ট্রেন এতদিনের চেনা রেললাইনে সুন্দর ভাবে ছুটে চলবে, এটাই কাম্য।

(লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক)

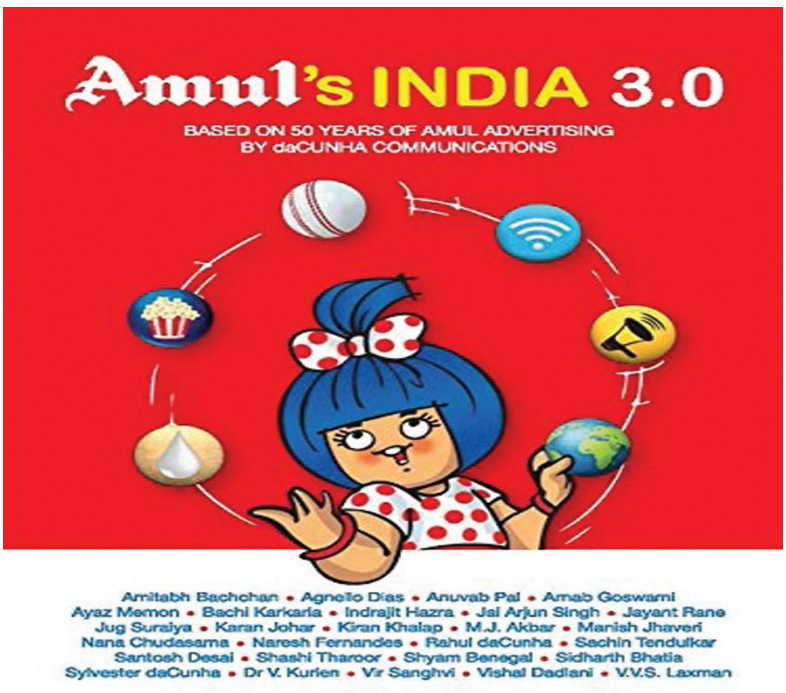



জীবনের উৎসব ভাইফোঁটা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

সহোদর-সহোদরা। সবচেয়ে পবিত্র, সবচেয়ে মধুর এই সম্পর্ক। সব অর্থেই ভাই-বোন— একই বৃন্তে দুটি কুসুম। সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বিষাদে, বিপদে-উৎসবে একে অপরের পাশে দাঁড়ায় স্বাভাবিক এক আন্তরিক টানেই। এমন প্রীতিস্নিগ্ধ সম্পর্ককে মধুরতর করতেই বছরের দুটি দিনকে হিন্দুরা বেছে নিয়েছেন বিশেষ উৎসবের কেন্দ্র হিসেবে।

আশ্চর্যজনকভাবে, দুটি দিনই ভাই-বোনের একান্ত নিজস্ব দিন। তাই আনুষ্ঠানিক পুজোপাঠের চেয়ে হৃদয়ের টানটাই গুরুত্ব পায় এখানে। প্রাথমিক ভাবে যা ছিল নিতান্তই একটি ঘরোয়া বা লৌকিক উৎসব। পরবর্তীকালে এই উৎসবের অঙ্গে লাগে ধর্মীয় আচারের রং। তবে ধর্মীয় অনুশাসনকে দূরে সরিয়ে প্রাত্যহিক জীবনের উপাচারেই দিনদুটিকে অর্থবহ করে তোলা হয়। তাই হিন্দুর জীবনে দিন দুটি এত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দিন দুটি হলো শ্রাবণী পূর্ণিমার রাখিবন্ধন ও কার্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়ার ভাইফোঁটা বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্রই এইদিন দুটিতে ভাই-বোন উৎসবে মাতে অন্তরের টানে। রাখি পূর্ণিমায় পরস্পরের হাতে সুতো বা রাখি পরিয়ে ভাইরা শপথ নেয় বোনকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করার। অন্যদিকে কার্তিক মাসে দীপান্বিতা কালীপুজোর দু'দিন পরে বা পাঁচদিনের দেওয়ালির শেষদিন শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভাইয়ের কপালে চন্দন, কাজল ও ঘিয়ের ফোঁটা দিয়ে বোনেরা কামনা করে ভাইয়ের নীরোগ দীর্ঘজীবন। এই ভাবে পারস্পরিক শপথ ও শুভ কামনায় উজ্জ্বল এই দুটি দিন।

ভাইফোঁটা সম্পূর্ণ ভাবেই ভাই-বোনের এক আনন্দমুখর উৎসব। ঠিক কবে থেকে এই অনুষ্ঠানের সূচনা তা নির্দিষ্ট ভাবে বলা আজ আর সম্ভব নয়। তবে অনুমান করা যায়, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই ঘটে ভাইফোঁটার উদ্ভব নিতান্তই ঘরোয়া উৎসব হিসেবে। কালক্রমে তাকে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রূপ দিতেই পৌরাণিক কাহিনিতে প্রোথিত করা হয় এর উদ্ভবের শিকড়। তাও কোনো একটি নির্দিষ্ট কাহিনি নয়, একাধিক পৌরাণিক কাহিনির উল্লেখ করা হয়েছে এর উৎস হিসেবে।

প্রথম কাহিনি যম আর যমুনাকে নিয়ে। এটিই বেশি প্রচলিত। অন্তত বঙ্গদেশে। সূর্য আর সংজ্ঞার দুই ছেলে মেয়ে— যম আর যমুনা। সূর্যের তেজ সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা নিজের অনুরূপ ছায়াকে রেখে অন্তর্হিত হয়। চিনতে না পেরে ছায়াকে নিয়েই ঘর-সংসার করতে থাকে সূর্য। ছায়াই তখন সূর্য-গৃহিণী। ক্রমে বিমাতার ঈর্ষা ও ক্রোধ গ্রাস করে ছায়াকে। স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দেয় সৎ মেয়ে যমুনাকে। যমুনার বিয়ে হয় এক পরিবারে। যমুনা একা। বাপের বাড়ির কেউ খোঁজ রাখে না তার।

বহুদিন পরে যমুনার কথা মনে পড়ে যমের। বুকটা টনটন করে ওঠে। কালীপুজোর পরেই বোনকে দেখার জন্য রওনা হন যম। সেদিন ছিল কার্তিকের শুক্লা দ্বিতীয়া। যমুনার বাড়ি পৌঁছতেই আনন্দে যমুনা বরণ করে যমকে। কপালে ফোঁটা বা তিলক দিয়ে কামনা করে তাঁর দীর্ঘজীবন। বলে, এই দিনটিতে প্রতিটি ভাই স্মরণ করবে বোনকে। বোনেরাও কামনা করবে ভাইয়ের দীর্ঘজীবন।

শুধু কথা নয়। যমকে নানা ভোজে আপ্যায়িত করে যমুনা বসে তপস্যায়। যমের মঙ্গল কানায়। যমুনার সেই তপস্যার ফলেই যম লাভ করে অমরত্ব।

যম-যমুনার এই কাহিনি স্মরণ করেই বঙ্গপ্রদেশের বোনেরা ভাইকে ফোঁটা দিয়ে আজও বলে— 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা/ যম-দুয়ারে পড়ল কাঁটা/ আমি দিই ভাইকে ফোঁটা/ আজ অবধি ভাই আমার/ যম দুয়ারে নিম তিতা।'

অঞ্চল ভেদে এই ছড়ার আছে কিছু পার্থক্য। যেমন কোথাও কোথাও শেষ দুই চরণে বলা হয়, 'যম যেমন চিরজীবী/ ভাই যেন হয় তেমন চিরজীবী'।

যমকে যমুনার ফোঁটা দেওয়া থেকেই ভাইফোঁটার শুরু— এমনটাই প্রচলিত বিশ্বাস।

দ্বিতীয় কাহিনির নায়ক-নায়িকা শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর বোন সুভদ্রা। নরকাসুরকে বধ করে কৃষ্ণ আসেন বোন সুভদ্রার কাছে। সুভদ্রা ভাইয়ের কপালে তিলক পরিয়ে তাকে মিষ্টি খাওয়ান। সে

দিনটা ছিল কার্তিকের শুক্লা দ্বিতীয়া। তখন থেকে ভাইফোঁটা যা ভাইদুজের প্রচলন।

তৃতীয় কাহিনি লক্ষ্মী-বিষ্ণু ও বলীকে নিয়ে। একবার বলী বন্দি করেন বিষ্ণুকে। আটক রাখেন পাতালে। নানা ভাবে চেষ্টা করেও কেউ বিষ্ণুকে সেই পাতাল-কারাগার থেকে উদ্ধার করতে পারে না। অবশেষে এগিয়ে আসেন লক্ষ্মী। সোজা চলে যান বলীর কাছে। ভাই হিসেবে সম্বোধন করে বলীর কপালে তিলক এঁকে দেন লক্ষ্মী।

অভিভূত বলী ভ্রাতৃত্বের সেই বন্ধনকে স্বীকার করে বোন লক্ষ্মীকে কিছু উপহার দিতে চান। বলেন, আজ লক্ষ্মী যা চাইবেন, তাই দেবেন তিনি।

লক্ষ্মী বলেন, যদি সত্যিই আমাকে খুশি করার জন্য কোনো উপহার দিতে চাও, তাহলে মুক্তি দাও আমার পতিদেবতা বিষ্ণুকে। তিনি ছাড়া যে আমি অসম্পূর্ণ। তাঁকে ফিরে পাওয়াই হবে আমার শ্রেষ্ঠ উপহার।

প্রতিশ্রুতি রাখেন বলী। মুক্ত করেন বিষ্ণুকে। লক্ষ্মীর হাতে তুলে দেন তাঁকে। সেই থেকেই ভাই-বোনের এই প্রীতির উৎসব ভাইফোঁটার শুরু।

চতুর্থ কাহিনিটির উৎস জৈন-পুরাণ। শেষ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের নির্বাণের খবর পেয়ে বিষাদমগ্ন হন তাঁর দাদা রাজা নন্দিবর্ধন। মহাবীর আর নেই— এই কথাটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি তিনি। সমস্ত রাজকাজ, আমোদ-আহ্লাদ ছেড়ে বিষাদের গভীর সাগরে ডুবে থাকেন তিনি।

নন্দিবর্ধনের ওই অবস্থা দেখে তাঁর বোন সুদর্শনাও বিমর্ষ হয়ে ওঠেন। তাঁরও মন লাগে না কোনো কাজে। কিছুদিন কাটে ওই ভাবে। একসময় সুদর্শনা সিদ্ধান্তে আসেন, দাদা নন্দিবর্ধনকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব নিতে হবে তাঁকেই। তাই দাদার কাছে এসে নানা ভাবে সান্ত্বনা দেন। মালা চন্দনে সাজিয়ে খুশি করেন তাঁকে। বোনের আপ্যায়নে সরে যায় নন্দিবর্ধনের মনের আকাশভরা শোকের মেঘ। স্বাভাবিক হন তিনি। তার পর থেকে ওই দিনটি পালিত হতে থাকে ভাইকে খুশি করার, তার কপালে তিলক পরানোর দিন বা ভাইফোঁটা হিসেবে।

ভাইফোঁটা সম্পর্কিত প্রতিটি পৌরাণিক কাহিনিরই মূলকথা, ভাই-বোনের প্রীতি ও মমতা। শুধু তাই নয়, এই উৎসব বা অনুষ্ঠান ভারতের কোনো একটি অঞ্চল বা প্রদেশে সীমাবদ্ধ নয়। এই উৎসব পালিত হয় ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্ত জায়গাতেই। নাম বিভিন্ন হলেও সর্বত্রই এই উৎসবটি পালিত হয় ভাই-বোনকে ঘিরে। সাধারণ ভাবে উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্রই এর নাম ভাইদুজ, দক্ষিণ ভারতে আবার একে বলা হয় যম দ্বিতীয়া। তবে অঞ্চল ভেদে এই উৎসব আরও বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন মহারাষ্ট্রে এই উৎসবকে বলা হয় ভাউবীজ বা ভাববীজ, অন্ধ্র, তেলেঙ্গানা প্রভৃতি অঞ্চলে একে বলা হয় ভ্রাত্রদ্বিতীয়া বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভগিনী হস্তভোজনম। নেপালেও দিনটি পালিত হয় একই উৎসাহ এবং আন্তরিকতায়। সেখানে এর নাম ভাইটিকা। উত্তর ভারতের কোথাও কোথাও একে বলা হয় ভাইতিলক। তবে সর্বত্রই এই উৎসব ভাই ও বোনের উৎসব।

ভাইফোঁটা মূলত একটি ঘরোয়া বা পারিবারিক অনুষ্ঠান। মূল কথা হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলন। সারা বছরের নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যেও এই দিনটিতে বোন বা দিদির আমন্ত্রণে দাদা-ভাইরা সব কাজ ছেড়ে চলে আসেন তাঁদের কাছে। বলতে কী দিনটির জন্য যেন থাকে সারা বছরের প্রতীক্ষা। দিনটি যেন নিজেদের ফিরে পাওয়ার, অতীত স্মৃতিচারণার এক অমূল্য মুহূর্ত। তাই অন্য কোনো পুজো নয়, হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা শুভ কামনাতেই বরণ করা হয় দিনটিকে।

আনুষ্ঠানিক পুজো ছাড়া সম্পূর্ণ ঘরোয়া বা পারিবারিক পরিবেশে পালিত এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে পরবর্তীকালে কোথাও কোথাও যুক্ত হয়েছে যম ও চিত্রগুপ্তর পুজো। সেই পুজোর জন্য আনা হয় পুরোহিতকে। তবে সামগ্রিকভাবে তা মূল অনুষ্ঠানকে তেমন ভাবে প্রভাবিত করতে পারে না। তাই কোনো পুরোহিতের সাহায্য ছাড়াই সংস্কৃত নয়, বাংলা আঞ্চলিক ভাষাতেই ছড়া কেটে ফোঁটা দেওয়া হয় সর্বত্র। তবে সংস্কৃতায়নের প্রভাবে ভাইয়ের হাতে অন্ন বা চরু তুলে দেওয়ার সময় মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়— ভ্রাতস্তবানুহাতাহং ভুঙ্ক্ষ ভক্তমিদং শুভম্। প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ। বোন বড়ো হলে ভ্রাতস্তবানুর পরিবর্তে 'ভ্রাতস্তবাগ্র' বলা হয়।

ভাইফোঁটা হলো জীবনের উৎসব। সমস্ত জীবনেরই উৎস তো সূর্য। তাই এই উৎসবকে সূর্যসাধনারই একটি রূপ বলে মনে করেন কেউ কেউ। তাঁদের মতে এই অনুষ্ঠানের বেশিরভাগ উপচারই হলো সূর্যের কোনো না কোনো প্রতীক। এই অনুষ্ঠানে ফোঁটা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত চন্দনকে তুলনা করা হয় তরুণ সূর্যের রক্তাভতার সঙ্গে। বিশেষ করে উত্তর ভারতে তিলকের রক্তচন্দনকে সূর্যেরই রূপক হিসেবে কল্পনা করা হয়। একই ভাবে এই অনুষ্ঠানের অপরিহার্য উপকরণ— ধান, দুর্বা, চন্দন ইত্যাদি পরিপুষ্ট হয় সূর্যেরই তেজে। শস্যই জীবন ধারণের মূল উপাদান। সূর্যতেজে পুষ্ট শস্য ভোজনের মাধ্যমেই জীবন হয় সুন্দর ও সতেজ। এই ভাবেই ঠেকিয়ে রাখা যায় মৃত্যু বা যমকে। যম বা মৃত্যুকে দূরে রাখার কামনাতেই হিন্দুর ঘরে ঘরে হয় ভাইফোঁটা বা যম দ্বিতীয়া বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আয়োজন। বলা যায়, ভাইফোঁটা হলো অনন্ত জীবনের কামনায় অনুষ্ঠিত এক আন্তরিক অনুষ্ঠান। □



ভাইফোঁটার অর্থ যুদ্ধ-চারণা, হিন্দুপুরুষকে বীর-তিলক কেটে দেওয়া

কল্যাণ গৌতম

যুদ্ধ ও সংগ্রাম আমাদের প্রতিনিয়ত করতে হয়। কৃষিক্ষেত্র থেকে যুদ্ধক্ষেত্র, গোষ্ঠী আক্রমণ থেকে বৈদেশিক আক্রমণ— সব ক্ষেত্রেই টিকে থাকার লড়াই জারি থাকে, জয়ী হবার অদম্য বাসনা স্থান পায়। জীবনের লড়াইয়ে নামার পথে প্রেরণাদায়ী সুভাষণ যেমন আছে ভারতীয় সংস্কৃতিতে, আছে ব্রত-পালাপার্বণের নানান বৈচিত্র্য। ভাইফোঁটার প্রকৃত তাৎপর্য হয়তো লড়াইয়ের ময়দানে যাবার আগে সহযোগিতা, সমমর্মিতার প্রকাশস্থল। তারই নৈকট্য ও অবয়ব বড়ো করার অনুষ্ঠান। ভ্রাতৃত্বের জগৎ যতটা বাড়বে, জয়ের সীমানা ততটাই বেড়ে যাবে। দোরগোড়ায় জয়ধ্বনি দিয়েই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জয়ের পরিকল্পনা শুরু করতে হয়। যমের দুয়ারে কাঁটা ফেলে ভাইকে জীবনযুদ্ধে অতিরিক্ত সাহস জোগায় বোন। যুদ্ধে যাবার পথে বিজয়ী হবার শুভকামনা জানায় ভগিনীমণ্ডলী। বোনের মানমর্যাদা-সম্মান রক্ষা করার শপথ নেন ভাই। ফিরে এসে তারই বিজয়োৎসব চলে, এর মধ্যেই চিরকালীন যুদ্ধ-চারণা বা War-lore-র জন্ম। ভাইফোঁটার মধ্যে এই দুই অনুভব, অব্যক্ত কথন— কালের গতিতে সংযুক্ত হয়ে গেছে কখন, তার টেরও পাইনি।

অতীত চারণার মধ্যে তার রূপক সংকেতগুলি সরিয়ে মূল কাঠামো বের করার মধ্যেই তার যথার্থ তাৎপর্য। ভাই যাবে যুদ্ধে, সংগ্রামে— জীবন সংগ্রাম থেকে ধর্মযুদ্ধে। সর্বত্রই তাকে জয়ী দেখতে চান ভগিনীবৃন্দ। তাই প্রয়োজন হয় মানসিক শক্তি বিতরণের প্রয়াস। দৈনন্দিন ঘরকন্নার কাজে নিয়ত নির্ঝরিণীর মতো ভগিনীদের সমবেত উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাইরের অশুভ শক্তিকে প্রবল বিরুদ্ধাচারণের মধ্যে দমন করা, জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার মধ্যেই ভাই-বোনের চিরকালীন জীবনচর্যা। তারই আলোকে ভাইয়ের কপালে বোনের জয়তিলক পরানোর পার্বণ। যমে-মানুষে টানাটানির মধ্যেই বেঁচেবর্তে থাকার শাশ্বত প্রয়াস। আবহমানকাল ধরে প্রচলিত সংস্কৃতির মধ্যে তার কতটা খোঁজ আমরা রেখেছি? কতটাই বা সুলুকসন্ধান করেছি? বোনের মান-ইজ্জত বাঁচাতে কখন ভাইকে অস্ত্র ধরতে হবে, কখন ধর্ষককে প্রতিহত করে সমাজকে সুন্দর রাখতে হবে— তার ইতিবৃত্ত যদি আমরা অনুমান করতে অসমর্থ হই, তাহলে আমরা অনেক জরুরি বিষয়কে বুঝতে অপারগ হবো। লাভ-জেহাদ, নারী মাংসের পিণ্ড ভোগ-লালসার সংস্কৃতি যেখানে ধর্মের মোহে অত্যাচার হয়ে দেখা দেয়, সেখানে ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকে তার বিপ্রতীপে সজাগ ও সক্ষমতার লড়াইকে স্মরণ করিয়ে দেবে। হিন্দু ভাই-বোনের সম্প্রীতির দ্যোতক হয়ে উঠবে সেই উৎসব।

একটি অনাথ বালকাশ্রমে কেটেছে আমার ছোটোবেলা। ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে যেসব ছাত্রেরা বাড়ি যেতে পারতো না, আশ্রম কর্তৃপক্ষ অবস্থানরত ছোটো বালকদের দিয়েই অন্য ছাত্রদের ফোঁটা দেওয়াতেন। জীবনের পথে দাঁড়িয়ে ছোটো ভাইদের স্বনির্ভর করে তুলবে, তাদের পড়াশোনার খোঁজ নেবে, কখনও পড়ানোর খানিক খরচ জোগাবে, প্রতিষ্ঠিত হবার নানান দিকদর্শন করবে, তার জন্যই আমাদের এই প্রয়াস। ভাইফোঁটায় বোনের অবস্থান যেমন অনেকটা কোমলতাকে রক্ষার জন্য, এখানেও অনাথ ছোটো ভাইদের প্রতিষ্ঠা করার শপথ নিক বড়ো দাদারা, আমরা এটাই আকাঙ্ক্ষা করি, জানিয়েছিলেন সেদিনের সন্ন্যাসীরা। হয়তো তাই। শরীরের কারণে নারী অনেকটা দুর্বল, তাদের রক্ষা করতে পারে ইস্পাত-সম পেশীবহুল পুরুষ। বয়সের কারণে আগে প্রতিষ্ঠা পাবে, আশ্রমের বাইরে আগে লড়াইয়ের ময়দানে নামবে উঁচু ক্লাসের বালকেরা। জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়ে তারা কমবয়সীদের খোঁজ খবর নেবে, এটাই আশ্রম কর্তৃপক্ষের ভাবনা ছিল।

ভাইফোঁটাকে হিন্দু সমাজ আজ পবিত্র এক সামাজিক অনুষ্ঠান হিসেবে গ্রহণ করুক। আমাদের দেশের কোনো কোনো স্থানে বিশেষত সীমান্তবর্তী জেলা/শহর/গ্রামে, প্রতিবেশী দেশে যখন দেখি হিন্দু মেয়েরা বিদ্যালয়ে পড়তে যেতে পারে না, দূরে পড়াশোনা করতে যাওয়া নিরাপত্তার কারণে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, লোলুপ নারী- লুণ্ঠনকারীরা দিনের নির্জনতায়, রাতের অন্ধকারে রক্তপিপাসু বন্য-শ্বাপদের মতো ওত পেতে থাকে, সেখানে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কী পারে না, এই কোমলপ্রাণ হিন্দু নারীর সম্ভ্রম সমবেতভাবে রক্ষা করতে? পাশাপাশি হিন্দু বোনটি কি সক্ষমতায়, ক্ষাত্রতেজে দাদার সমান হয়ে ওঠার শপথ নিতে পারে না? পাড়া-মহল্লায় ভাই-বোনের এক হয়ে শপথ নেওয়ার দিন হোক

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। পশুশক্তিকে নারীদেহ খুবলিয়ে খেতে দেওয়া চলে না, কোনো অবস্থাতেই নারীকে ভোগ্যপণ্য করে তোলা চলে না, কখনোই অবলাকে অশুভ শক্তির কাছে ছেড়ে দেশত্যাগ করা চলে না। ভাইফোঁটায় সহোদরা ভগিনী কেবল নয়, পুরো গ্রাম, শহর, নগরের সকল ভগিনীকে রক্ষা করার শপথ নিতে হবে, ভগিনীবৃন্দ জয়তিলক পরিয়ে দেবে সম্ভ্রম রক্ষাকারী সমন্বিত ভ্রাতৃশক্তিকে।

ভাইফোটায় ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে যে ছড়া আবৃত্তি করা হয়, তাতে ভাইয়ের আয়ু বৃদ্ধির প্রার্থনা আছে। ভাইকে অমর করার হোয়াইট ম্যাজিক যেন! মৃত্যুর দেবতা যমের দুয়ার থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার অগ্রিম মেয়েলি আচার। তা যমের লিখন রদ করার লক্ষণীয় প্রার্থনা, দীর্ঘ জীবনের এক অনাময় আকাঙ্ক্ষা, ভাইবোনের এক নিষ্কাম স্নেহ-শুভেচ্ছার বাতাবরণে—

'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।
যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।
যমুনার হাতে ফোঁটা খেয়ে যম হলো অমর।
আমার হাতে ফোঁটা খেয়ে আমার ভাই হোক অমর।।'

এইজন্য ভাইফোঁটার নাম কোথাও কোথাও যমদ্বিতীয়া। যেহেতু কার্তিক মাসের শুক্লাপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে এই উৎসব, তাই 'দ্বিতীয়া'। লোকবিশ্বাস এই, এদিন মৃত্যুর দেবতা যম তার আপন ভগিনী যমুনার হাতে ফোঁটা নিয়েছিলেন, তাই 'যমদ্বিতীয়া'। কেন যমুনা তার ভাইকে ফোঁটা দিলেন, তা আর এক লোকায়তিক কাহিনি। সূর্য (বিবস্বান) ও সংজ্ঞার গর্ভে যম (বৈবস্বত) ও যমুনা নামক যমজ সন্তানের জন্ম হয়। তারপর দেখা যায়, সূর্যের প্রবল তাপ সইতে না পেরে ছেলে-মেয়ে এবং নিজের ছায়াকে সূর্যলোকে রেখে ফিরে যাচ্ছেন সংজ্ঞা। এদিকে সেই ছায়াই হয়ে উঠলো সূর্যলোকের অধিশ্বরী। তারই দাপটে যম-যমুনা হলেন স্বর্গছাড়া। অবশেষে নানান ঘাত-প্রতিঘাতে যম হয়ে উঠলেন মৃত্যুপুরীর রাজা, পৃথিবীর নদী যমুনা হয়ে ঠাঁই পেলেন বোন। একদিন বোন নিমন্ত্রণ করলেন তার দাদাকে। দাদা এলেন, দাদার যথাযোগ্য যত্নআত্তি করলেন বোন, কপালে পরালেন টিকা। দুজনের অনেক গল্প হলো, খাওয়া দাওয়া হলো, তারপর ফিরে গেলেন দাদা। লোকবিশ্বাস সেই থেকেই যমদ্বিতীয়ার আয়োজন। যে দেবতা মৃত্যুর অধীশ্বর, তার কাছেই জীবনের প্রার্থনা— এ এক অপরূপ বৈপরীত্য।

শুধু বঙ্গদেশে নয়, ভারতের নানান অঞ্চলে ভাইফোঁটা নানান নামে উদ্‌যাপিত হয়। কোথাও এর নাম 'ভাইদুজ' (উত্তর ভারত), কোথাও 'ভাইবিজ' (মহারাষ্ট্র, গোয়া, কর্ণাটক), কোথাও 'ভাইটিকা' (নেপাল, দার্জিলিং)। কোনো কোনো লোকবিশ্বাস এইরকম— শ্রীকৃষ্ণ বোন সুভদ্রার কাছে ফোঁটা নিয়েছিলেন নরকাসুরকে বধ করার পর। এইভাবে অসুর বা অশুভ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধের প্রেরণা হয়ে ওঠে ভগিনীশক্তি। পৃথিবীতে ভগিনীর জন্য নিরাপদ বাসভূমি গড়ে তুলবে ভ্রাতা। ভাইফোঁটা মানে নারীশক্তির বসবাসের ভূমি প্রতিষ্ঠা করে নিরাপদ আলয় রচনার উৎসব। ভ্রাতৃশক্তি যত দ্রুত ভগিনীর গৃহ রচনা করে দিতে পারবে, ততই বঙ্গপ্রদেশে তথা ভারতকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উদ্‌যাপন সার্থকতা লাভ করবে। ▯

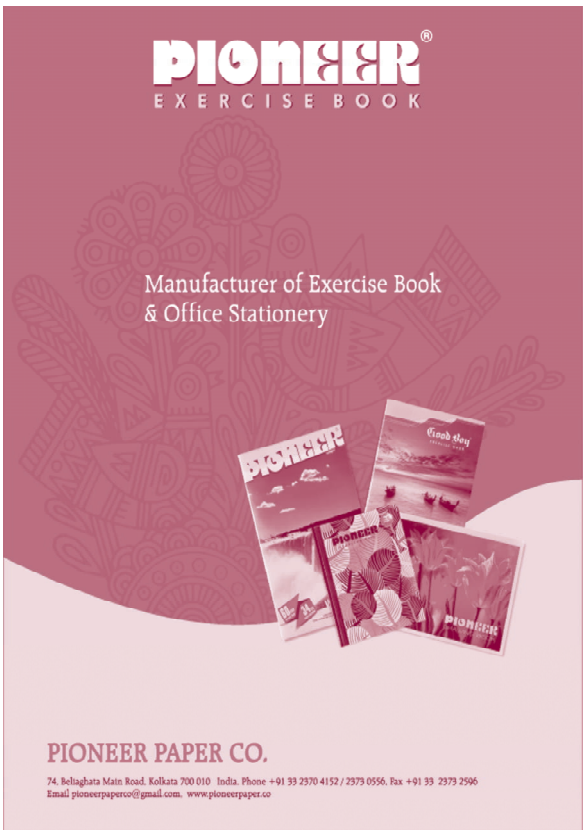





ভাই-বোনের চিরন্তন সম্পর্কের উৎসব ভাইফোঁটা

ধীরেন দেবনাথ

হিন্দু পুরাণের জনপ্রিয় প্রচলিত লোককাহিনি অনুসারে, দুষ্ট রাক্ষস নরকাসুরকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বধ করার পর তাঁর বোন সুভদ্রার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি তাঁকে ফুল ও মিষ্টি দিয়ে জানান উষ্ণ অভ্যর্থনা। এছাড়াও বোন সুভদ্রা সস্নেহে শ্রীকৃষ্ণের কপালে বা ললাটে এঁকে দেন তিলকের ফোঁটা। অনেকের বিশ্বাস, সেই থেকে 'ভাইফোঁটা' উৎসবের আরম্ভ। স্থান ও অঞ্চল বিশেষে ভাইফোঁটা বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন— ভাইদুজ, ভাইবীজ, ভাউবীজ, ভাইটিকা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ইত্যাদি। বঙ্গে উৎসবটি ভাইফোঁটা নামেই অধিক পরিচিত।

হিন্দু সমাজে ভাইফোঁটা উৎসবটি কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে পালিত হয়ে থাকে। রাজা বিক্রমাদিত্য বা শালিবাহন প্রবর্তিত যথাক্রমে হিন্দু বা শক পঞ্জিকা অনুসারে, যা খ্রিস্টপূর্ব ৫৬ অব্দে প্রণীত, কার্তিকী অমাবস্যা তিথিতে দীপাবলী ও শ্যামাপূজার দুদিন পরে উদ্‌যাপিত হয় এই পবিত্র ও শুভ পর্বটি। এই দিনে বোন উপবাসী থেকে শুচিশুদ্ধ মনে ভাইয়ের কপালে চন্দন বা তিলকের ফোঁটা এঁকে ভাইয়ের দীর্ঘজীবন, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে। পরম করুণাময় ঈশ্বরের শুভাশীর্বাদ প্রার্থনা করে, ধূপ-দীপ জ্বেলে এক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ভাইও প্রতিদানে বোনের সারাজীবনের সুরক্ষার কঠিন শপথ নেয়। তারা স্নেহানুরাগের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই উপলক্ষ্যে ভাই বোনের হাতে বস্ত্রাদি প্রদান করে থাকে। বোন ভাইকে নিজহস্তে ভোজন করিয়ে তার হাতেও কিছু উপহার তুলে দেয়। অদ্যাবধি এই রীতিই চলে আসছে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটার দিন কোনো ভাইয়ের কপালে ফোঁটা এঁকে দেওয়ার সময় ভাইয়ের সার্বিক মঙ্গল ও কল্যাণার্থে উচ্চারণ করে— 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা। যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা, আমি দি আমার ভাইকে ফোঁটা। কাঁটা যেন নড়ে না, যম যেন আসে না।' একথার মর্মার্থ, ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা। মানুষের বিশ্বাস, মানুষের মৃত্যুদূত হচ্ছে যম। সেই যম যেন ভাইয়ের ধারেকাছে না আসে। ভাই যেন যমের কুদৃষ্টি ও ছোঁয়া থেকে সহস্র যোজন দূরে থাকে। অর্থাৎ ভাই যেন দীর্ঘদিন সুস্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচেবর্তে থাকে
পৃথিবীতে।

ভাইফোঁটা নিঃসন্দেহে সামাজিক ও আত্মিক রীতি। এর সঙ্গে ধর্মের খুব একটা সম্পর্ক নেই। তবে এই দিনটির গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের কথা স্মরণ ও মনন করে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মঠ ও মন্দির বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার্চনার আয়োজন করে থাকে। অন্নকূট মহোৎসবও হয়। কেউবা আবার করে গো-পূজন। কোথাও কোথাও এই দিনের মধ্যাহ্নে হয় যমরাজের (ধর্মরাজ) পূজাও। হয় যমুনা, চিত্রগুপ্ত, যমদূত পূজা ও যথার্থ দানও। বিহারে হয় এই দিনে দোয়াত পূজা ও ভাইদুজ এবং মণিপুরে হয় Ningol Chakkouba Festival। এই দিনে শুরু হয় বিক্রম সংবৎ ২০৭৬ (চান্দ্রবর্ষ) এবং মহাবীর নির্বাণাব্দ ২৫৪৬ (চান্দ্রবর্ষ)। এছাড়াও হয় শ্রীশ্রী বলী দৈতরাজ পূজা, শ্রীশ্রী গোবর্ধন পূজা ইত্যাদি।

সত্যি বলতে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিটি শুধু ভাইফোঁটার জন্যই তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এই দিনটি বা তিথিটি হিন্দুসমাজের কাছে বিশেষত বাঙ্গালির কাছে একটি পবিত্র দিন রূপে পরিগণিত হয়। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিটিকে শুধু ভাইফোঁটা উৎসবের তিথি বা দিন রূপে উদযাপন বা পালন করলেই দিনটির তাৎপর্য বা ইতিকর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। হিন্দু সমাজে ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যকার আত্মিক ও মানবিক সম্পর্কটি

যে কত মধুর ও পবিত্র সেটাই প্রকাশ করে ভাইফোঁটা। ভাই ও বোনের সম্পর্ক যেন 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম'— একে অপরের নয়নমণি। এটি একটি লোকাচার হলেও এটির বিশ্বজনীন তাৎপর্য ও মানবিক মূল্যবেধের দিক রয়েছে। একমাত্র হিন্দু ধর্মেই রয়েছে ভাই ও বোনের মধ্যে অনাবিল সম্পর্ক ও ভালোবাসা আর ভাই-বোন আপন হোক বা খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো, পিসতুতো, মামাতো, মাসতুতোই হোক। সেখানে অন্যান্য ধর্ম বা মনতাবলম্বীদের মধ্যে আপন ভাই-বোন বা সহোদর-সহোদরা ভিন্ন অন্য ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ের প্রচলন ও দৈহিক সম্পর্কের বিধান রয়েছে। ভোগবাদীদের কাছে এটাই দস্তুর। আরবীয় ও পাশ্চাত্যবাসীদের মধ্যে বিশেষত খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্মাবলম্বী বিশ্বাসীদের মধ্যে রয়েছে এই রীতির প্রচলন। তা তারা যে দেশেই বাস করুক না কেন। এটাই তাদের সংস্কৃতি।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ''আমাদের শাস্ত্র বলছে, একই বংশভুক্ত হলে এবং তা যদি অতি দূর সম্পর্কেরও হয়, তাহলেও সেখানে বিবাহবন্ধন নিষিদ্ধ, সে বিবাহ অসিদ্ধ, অশাস্ত্রীয়, জাতির পক্ষে তা অধঃপতনের কারণ, জাতিকে তা জড়বুদ্ধি করে তোলে। সুতরাং তা হতে পারে না। আমার ভগ্নী, এটুকুই যথেষ্ট। ভাইয়ের ক্ষেত্রেও তাই, সে আমার ভাই, এইটুকু জানাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং পরস্পরকে তারা ভালোবাসবে।'' (ভারতের নারী : ১৮.১.১৯০০, ক্যালিফোর্নিয়ার সেক্সপিয়র ক্লাবে প্রদত্ত ভাষণ থেকে)।

চিকাগোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে (১১.৯.১৮৯৩) বক্তাদের মধ্যে একমাত্র স্বামীজী শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধিত করতে গিয়ে বলেছিলেন— 'Sisters and brothers of America.' সম্বোধনের প্রথমে ভগ্নীদের উল্লেখ থাকায় অভিভূত শ্রোতৃবৃন্দ কয়েক মিনিটের তুমুল করতালি দ্বারা স্বামীজীকে অভিনন্দিত করেন। বিদেশিনী মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল স্বামীজীর শিষ্যা হয়ে আর 'Miss' থাকেননি, 'ভগিনী' নিবেদিতা হয়েছেন। এখানেই ভারতীয় বোনদের মহত্ত্ব— ভাইফোঁটার সার্থকতা তথা ভাই-বোনের অমলিন ভালোবাসার সত্যতা। □

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩



ভাইফোঁটা— একটি অনিন্দ্যসুন্দর উৎসব

সুতপা বসাক ভড়

ভাই-বোনের পবিত্র সম্পর্কের এমন উৎসব বিশ্বে কেবলমাত্র ভারতীয় উপমহাদেশেই দেখা যায়। মানবজীবনে ব্যক্তিবিশেষের বিভিন্ন জনের সঙ্গে বিভিন্নরকম সম্পর্ক। এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে ভাই-বোনের এই মিষ্টি মধুর পবিত্র সম্পর্ক। ভারতে রাখিবন্ধন ও ভাইফোঁটা দুটি উৎসবই ভাই-বোনের উৎসব— যা সমগ্র দেশে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়ে থাকে।

ভাই-বোনের নিজেদের মধ্যে একটি সুন্দর বোঝাপড়া থাকে। তারা একে অপরের বিশ্বস্ত বন্ধু, একে অপরের রক্ষাকর্তা। নিজেদের মনের কথার শরিক আবার নিঃস্বার্থ ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ একটি সম্পর্ক। নিজেদের মধ্যে মুহূর্তের ঝগড়া আবার পরক্ষণেই শর্তহীন দুর্বোধ্য ভালোবাসা— যা ব্যাখ্যার অতীত। কেবলমাত্র এই ভালোবাসার ওপর ভিত্তি করে আছে ভাইফোঁটার মতো উৎসব। এদিন ভাই-বোনের সম্পর্ক দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর , পবিত্র থকে পবিত্রতর হয়ে ওঠে। বোনেরা ভাই বা দাদাদের দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। দাদা বা ভাইয়েরা দিদি বা বোনেদের দেয় অকুণ্ঠ ভালোবাসা এবং নিরাপত্তার অঙ্গীকার।

আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই উৎসবটি বিভিন্ন নামে পরিচিত। উত্তরভারতে ভাইদুঁজ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কোঙ্কনে ভাই- বীজ বা ভাউবীজ এবং পশ্চিমবঙ্গে ভাইফোঁটা নাম প্রচলিত। নেপালে এর পরিচয় ভাইটীকা নামে। কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াতে এই উৎসব পালন করা হয়। দক্ষিণ ভারতে এটি যমদ্বিতীয়া নামে প্রচলিত।

ভাইফোঁটা সংক্রান্ত দুটি পৌরাণিক কাহিনি আছে। একটি কাহিনিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুর নামক দৈত্যকে বধ করে ফিরে এলে বোন সুভদ্রা তাঁকে ফুল-ফল-মিষ্টি দিয়ে স্বাগত জানান। কপালে এঁকে দেন মঙ্গলটীকা। শ্রীকৃষ্ণের কপালে সুভদ্রা ফোঁটা দিয়েছিলেন— তখন থেকেই ভাই ফোঁটার প্রচলন।

অপর একটি কাহিনি অনুসারে মৃত্যুর দেবতা যম কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াতে বোন যমুনার সঙ্গে দেখা করতে তাঁর গৃহে যান। ওইদিন যমুনা ফুল-ফল-মিষ্টি এবং কপালে ফোঁটা দিয়ে দাদা যমকে স্বাগত জানান। এজন্য এই দিনটি যমদ্বিতীয়া নামেও পরিচিত হয়। যম বোন যমুনাকে বর দনে যে ওইদিন ভাইরা যদি পুণ্যতোয়া যমুনা নদীতে স্নান করে বোনের হাতের ফোঁটা নেন তবে তারা মুক্তি লাভ করবেন। অসময়ে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। অপরদিকে যেসব বোন বা দিদি তাদের ভাই বা দাদাদের ফোঁটা দিয়ে তাদের হাতে বানানো ফল মিষ্টি নিবেদন করবে, তারা চিরসৌভাগ্যবতী হবে।

ভাই-বোনের পরস্পরের প্রতি যত্ন-ভালোবাসা, শ্রদ্ধার এই বিশেষ পর্বটি খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়ে থাকে। এখনও বোনেরা এই দিনটির জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়— বাড়িতে ভাইদের পছন্দমতো রান্না করা, সাধ্যমতো উপহার দেওয়া, পাঁচরকম মিষ্টি সাজিয়ে অপেক্ষা করে থাকে সেই শুভ মুহূর্তের জন্য যখন তার দাদা বা ভাই শুদ্ধ বসনে, শুদ্ধ আসনে বসে তার হাতের ফোঁটা নেবে। প্রদীপের শিখা, চন্দনের ফোঁটা, ধান-দূর্বার আশীর্বাদ— এই তো কেন্দ্র ওইদিনটির। তারপর শঙ্খধ্বনি-উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে তাদের আকুল প্রার্থনা— 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা...'।

ঈশ্বরকে অসীম কৃপায় এই চূড়ান্ত ভোগবাদের মধ্যেও চতুর্দিকে প্রযুক্তির নির্মম অত্যাচার, সর্বোপরি চরম শত্রু করোনার প্রাদুর্ভাবের মধ্যেই ভারতীয় ভাই-বোনেদের কাছে এই দিনটির গুরুত্ব এখনও অম্লান। এখানেই এই উৎসবের সার্থকতা!

□



বামপন্থী কুনাট্য-রঙ্গে লোক মজলো না অঙ্গে আর বঙ্গে

সেই কবেই মধু-কবি লিখে গিয়েছিলেন, 'অলীক কুনাট্য রঙ্গে লোকে মজেছে রাঢ়ে-বঙ্গে'। কিন্তু সময় এখন বদলেছে, মানুষও পরিণত হয়েছে। তাই বামপন্থী কুনাট্য রঙ্গে বঙ্গ আর অঙ্গের (বিহারের প্রাচীন নাম) লোক মোটেও মজলো না। নইলে সম্পূর্ণ 'প্যাকেজটা' খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। এতদিন জানা ছিল, আমেরিকান মানেই 'সাম্রাজ্যবাদের দালাল' গোছের কিছু হবে। ট্রাম্প-রাজত্বে জানা গেল, নানা পারমুটেশন-কম্বিনেশনের (মানে মার্কসবাদী, লেনিনবাদী, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এরকম আর কী!) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রবল ডেমোক্র্যাট ভক্ত। এতটাই যে 'কমরেড' জো বিডেনের জয়ে নানা কিসিমের বামপন্থীদের উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা দেখলে কে বলবে নিজেদের দেশে এদের সাত শতাংশ ভোটও জোটে না। আদার ব্যাপারি হয়ে জাহাজের ব্যাপারে নাক গলানো বামপন্থীদের চিরকালীন অভ্যাস। যেমন নিকুরাগুয়ায় সমবায় নির্বাচনেও জিতলে পশ্চিমবঙ্গে এককালে বিজয় মিছিল হতো। তবে 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদে'র বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার যাদের আন্তর্জাতিক আদেখলাপনার সর্ববৃহৎ পুঁজি ছিল এককালে, তারা সদ্যনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বিডেনকে এক লহমায় যেভাবে 'কমরেড' বানিয়ে ফেললো, তাতে বলতেই হয় 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গে ভরা'।

তবে এই কুনাট্য কমেডির শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য হলো বিহার নির্বাচনে বামন্থীদের সাফল্য সাড়ম্বরে ঘোষণা করা। এটা শুনলে ঘোড়ারও হাসতে গিয়ে দম আটকাবে। নকশালিদের কিছু গড় এলাকা বিহারে আছে সত্যি। তার থেকে দু-একটা বিধানসভা আসনেও ভাগ্য শিকে ছেঁড়ে, একথাও ঠিক। এমনিতে নকশালিদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক-পন্থার বামপন্থীদের অর্থাৎ সিপিএম-সিপিআইয়ের ভূ-ভারতে কোথাও বিশেষ কোনও সম্পর্ক নেই। বরং নকশালিরা সিপিএম-সিপিআইকে শ্রেণীশত্রু ব্যতীত আর কিছু মনে করে না। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে, ঠেলার নাম বাবাজী। প্রথমে জেএনইউ, তারপরে বিহার। অগণতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক বামপন্থীরা অস্তিত্বের সংকট ঠেকাতে একজোট হয়ে লড়ল। এবং বিহারে ভারতীয় রাজনীতিতে তাদের এতদিনের বিশ্বস্ত লালুপ্রসাদের আশীর্বাদ মাথায় না থাকলে ২৯টা আসনে লড়াই বামেদের একার কৃতিত্বে ২৯টা আসনে লড়াই দেওয়া সম্ভব হতো না, ১৬টি আসনে জেতাও দূরঅস্ত্ — এই সত্যিটা স্বীকার করতেই হবে। সংবাদে প্রকাশ, সিপিআই (এমএল) নেতা দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেছেন, কংগ্রেস-সিপিএম আসন সংখ্যা সমান সমান ভাগাভাগি করে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গেলে নাকি এনডিএ ক্ষমতাচ্যুত হতো। মানে বামপন্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আসন সংখ্যা বাড়লে জয়ের আসনও বাড়ত, কিন্তু কংগ্রেস ব্যর্থ হয়েছে, এমনটাই বলতে চেয়েছেন দীপঙ্করবাবু। হয় কংগ্রেসকে হেয় করার লক্ষ্যে তিনি একথা বলেছেন, যেহেতু গণতান্ত্রিক-ব্যবস্থায় অস্তিত্ব রক্ষার দায়ে বামপন্থী দলগুলির কংগ্রেসের লেজুড়বৃত্তি করছে, নকশালদের সে দায় নেই, তারা আপাদমস্তক কংগ্রেস-বিরোধী, অন্তত লোকদেখানো হলেও। নয়তো জেনেবুঝে ভারতের মানুষকে তারা বিপথে চালিত করছেন, ঠিক যে কাজ তাঁরা করেছেন পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে। তবে কিছু মানুষকে এক্ষেত্রে তারা বোকা বানালেও, কার্যসিদ্ধি যে হয়নি বিহার বিধানসভা নির্বাচন সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে। আসলে কংগ্রেস বিলুপ্ত হওয়ার আগে ভারতীয় রাজনীতিতে একটা ভাইরাস ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। সেটা হলো মূলত পরিবারতন্ত্রের আর জাতপাতের ভাইরাস। তবে দেশের প্রয়োজনে এখন জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থান এই মডেলকে পরিহাসের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে।

রাহুল গান্ধীকে দেশের রাজনীতিতে 'পাপ্পু' বলে পরিহাস করা হয়, তাঁর ভিত্তিহীন কথাবার্তা ও নির্বাচনী ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে। পশ্চিমবঙ্গে অভিষেক ব্যানার্জি, গুজরাটে জিগ্নেশ মেভানি-হার্দিক প্যাটেল এই 'পাপ্পু' মডেলেরই ফসল। এই মডেলেই ব্যর্থতা সত্ত্বেও উত্থান হয়েছিল

তেজস্বী যাদবের। কিন্তু লালুর জঙ্গলরাজ আজও বিহারের মানুষের মন থেকে ফিকে হয়ে যায়নি। ফলে প্রোপাগান্ডায় সাময়িক সাফল্য নিশ্চয়ই এসেছে, মিডিয়ার ভাষায় যা 'হাড্ডাহাড্ডি লড়াই'। কিন্তু জয় হয়েছে জাতীয়তাবাদী শক্তিরই। এবং প্রতিবারই যা হয় হারলেই নির্বাচন কমিশনকে ম্যানেজ, ইভিএম জাল ইত্যাদি থিয়োরি হাজির করানো হয়। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিরোধীদের কিছু নির্বাচনী সাফল্যের পর (যার মধ্যে মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যে অনৈতিক ক্ষমতা দখলও আছে) এই ধরনের তত্ত্বের সাময়িক বিরতি ছিল। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন এমনকী প্রথম দু' ঘণ্টায় যখন আরজেডি জোট এগিয়ে ছিল তখনও ওই 'ম্যানেজ', 'জাল' ইত্যাদি তত্ত্বগুলি ওঠেনি। হারতেই আবার 'কারচুপি' তত্ত্ব বাজারে আসর মাতাতে নেমে পড়েছে।

কমিউনিস্টরা গোয়েবলসীয় তত্ত্বে মনেপ্রাণে বিশ্বাসী, যে তত্ত্ব অনুযায়ী একই মিথ্যা বারংবার বলে তাকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করা। এরা জানে না, এসব অবান্তর কথা বলে লোক-হাসানো ছাড়া আর কোনও মহৎ কাজ হবে না, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবুও কেন এরকম করছে? কারণ একই মিথ্যা কথা বারবার বলতে থাকলে, কিছু লোক একসময় সেটা সত্য বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে। ট্রাম্পের বিরোধিতার একমাত্র কারণ মোদী এই বছরের গোড়ায় ফেব্রুয়ারির শেষদিকে 'নমস্তে ট্রাম্প' কর্মসূচির আয়োজন করেছিলেন। এটা মূলত ছিল, তার কিছুদিন আগে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে টেক্সাসে ট্রাম্পের 'হাউডি মোদী' কর্মসূচির প্রত্যুত্তরে পালিত একটি অনুষ্ঠান। এর সঙ্গে ভারত-আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কোনও সম্পর্ক ছিল না। ভারতের বিদেশনীতিতে যে মহার্ঘ্য পরিবর্তন এনেছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী, অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর আমল যে রাশিয়া অভিমুখী আমাদের বিদেশনীতি ছিল, সেই অভিমুখ বাজপেয়ী নিরপেক্ষ করে দিয়েছিলেন রাশিয়ার পাশাপাশি



আমেরিকাকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে। যার সুফল ভারত পরবর্তী সময়ে পেয়েছে, আজও পাচ্ছে। শুধুমাত্র এই বিদেশনীতির বলেই ভারত আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে দুই চিরশত্রু চীন-পাকিস্তানকে বর্তমানে একঘরে করতে পেরেছে। এতে আর কারোর অসুবিধে না হোক, কমিউনিস্টদের বিলক্ষণ হচ্ছিল। তাই ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এত উষ্মা। কিন্তু ট্রাম্প সরে গেলেও আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্কের যে অবনতি ঘটবে না, কিংবা আমেরিকার যে চীন-পাকিস্তান বিরোধিতায় কোনও ছেদ পড়বে না, তাদের স্বার্থেই, একথা কূটনীতির সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, এমন লোকও জানে।

কমিউনিস্টরা সব জেনে বুঝেও না জানার ভান করে আছে, কারণ অবলুপ্তির পথে যাওয়ার আগে শেষ খড়কুটোর ভরসায় আছে তারা, 'ট্রাম্প শেষ, এবার বোধহয় মোদীর পালা'।

ভারতের দুর্ভাগ্য, জাতীয়তাবাদী সরকার পালটালে তাদের বিদেশনীতিরও আমূল পরিবর্তন ঘটে। সেই বিদেশনীতিতে চীন-পাকিস্তানের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ ছাড়া আর অন্য কিছুর গত্যন্তর থাকে না, একথা প্রমাণিত সত্য। কমিউনিস্টরা সব জেনে বুঝেও না জানার ভান করে আছে, কারণ অবলুপ্তির পথে যাওয়ার আগে শেষ খড়কুটোর ভরসায় তারা আছে, 'ট্রাম্প শেষ, এবার মোদীর পালা' কিংবা 'বিহারে অভূতপূর্ব সাফল্য, বামপন্থীরা আগামীদিনে ক্ষমতায় আসছে' মার্কা বালখিল্যসম আচরণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ফালতু জোকস শুনিয়ে আর যাই হোক রাজনীতি যে হয় না, ভারতীয় রাজনীতিতে অবলুপ্ত এবং ক্ষতিকারকও, শক্তির সেই দেওয়াল লিখন পড়বার সময় এসেছে। □



পশ্চিমবঙ্গ কি রাষ্ট্রপতি শাসনের দিকে এগিয়ে চলেছে?

মণীন্দ্রনাথ সাহা

পশ্চিমবঙ্গে যেন ঝুলন্ত দেহের মিছিল শুরু হয়েছে। সেই ঝুলন্ত দেহগুলি সবই বিজেপি দলের হয় কোনো কর্মকর্তা, নয় সমর্থক, নয়তো দলের কোনো ছোটোখাটো পদাধিকারীর। যেমন ঝুলতে দেখা গিয়েছিল ২৯ মে, ২০১৮-তে বলরামপুরের ত্রিলোচন মাহাতোকে। তেমনি দেখা গেছে ২৬ জুন ২০১৮-তে পুরুলিয়ার দুলাল সরকার, ২১ অক্টোবর ২০১৮-তে লাভপুরের তাপস বাগদি, ১৮ এপ্রিল ২০১৯-এ বাগমুণ্ডির শিশুপাল সহিস, ৫ আগস্ট ২০১৯-এ পিংলার পিন্টু মান্না, ১৫ নভেম্বর ২০১৯-এ দাঁতনের বর্ষা হাঁসদা, ১৫ জুলাই ২০২০-তে হেমতাবাদের দেবেন্দ্রনাথ রায়, ২৯ জুলাই ২০২০ রামনগরের পূর্ণচন্দ্র দাস, ২৩ আগস্ট ২০২০ গোঁঘাটের সৌরভ মুখোপাধ্যায়, ২৬ অক্টোবর ২০২০ মোহনপুরের বাচ্চু বেরা এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের ঠিক ছ'দিনের মাথায় নদীয়ার গয়েশপুরে বিজেপি কর্মী বিজয় শীলের একই কায়দায় প্রাণ গেল। এছাড়াও গত দু-আড়াই বছরে বিজেপি দলের বিধায়ক-সহ সোয়া শতাধিক ব্যক্তিকে বিভিন্ন ভাবে হত্যা করা হয়েছে।

যে রাজ্যে বিধায়কের নিরাপত্তা নেই সেই রাজ্যে সাধারণের অবস্থা যে কীরকম হবে তা সহজেই অনুমেয়। পুলিশ প্রশাসনের এতে কোনো হেলদোল নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃতদেহ পোস্টমর্টেম করার আগেই পুলিশ মন্তব্য করে, আত্মহত্যা করেছে। এছাড়া তো সবজান্তা পুলিশের কোনও উপায়ও নেই। কেননা পুলিশ ও প্রশাসনের নিরপেক্ষ তরবারি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। স্বৈরাচারী শাসকরা বরাবর একই কায়দায় চলে। সেই স্বৈরাচারীরা কমিউনিস্ট হোক বা অন্য কোনো নামের হোক। সরকারি অর্থ নয় -ছয়, চাল-ডালের মতো গরিবদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে ফুলেফেঁপে ওঠার প্রতিবাদকে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বাধা দিয়ে, মেরেধরে যাঁরা মনে করছেন এভাবেই জনমত দাবিয়ে রেখে দীর্ঘস্থায়ী দানবীয় শাসন চালিয়ে যাবেন তাঁরা বড়ো ভুল করছেন। কেন ভুল করছেন তারই কতকগুলি উদাহরণ তুলে ধরার চেষ্টা করছি। সেই সঙ্গে তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই— ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় এবং ইতিহাস কাউকেই ক্ষমা করে না।

অত্যাচারী শাসকরা যদি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতেন তাহলে ১৭৭৫ সালের ২৩ মে

ভার্জিনিয়ার গণকনভেনশন থেকে প্যাটরিক হেনরির ডাকে সাড়া দিয়ে আমেরিকার মানুষ ১৭৭৬-এর ৪ জুলাই ব্রিটিশ রাজকে উৎখাত করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে পারতেন না।

অত্যাচারী শাসকরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিলে ১৭৯২ সালে ফরাসি রাজপরিবারকে পথে বসিয়ে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হতো না প্রজাতন্ত্র রিপাবলিক। ১৭৯৩ সালে গিলোটিনে গর্দানও যেত না রাজা ষোড়শ লুই এবং রানি মেরি আঁতোয়ানেতের। ১৯৭১-এ রক্তের হোলি আর বহ্ন্যুৎসবের মধ্যে দিয়ে আসত না বাংলাদেশের স্বাধীনতা। হতো না জরুরি অবস্থায় জীর্ণ, দীর্ণ ভারতের অভ্যুত্থান ১৯৭৭ সালে। জালিয়াতির মাধ্যমে ভোটের নামে প্রহসন করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী জনতার ভয়ে ফিলিপিন্সের একছত্র ক্ষমতার অধিকারী প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোসকে ১৯৮৬ সালে দেশত্যাগও করতে হতো না।

পূর্ব জার্মানির কমিউনিস্ট একনায়ক এরিক হোনেকার দেওয়ালের লিখন পড়তে পারেননি। শোনেননি, শুনতে চাননি ইতিহাসের রথচক্রের ঘর্ঘর বজ্রধ্বনি। ৭৫ বছরের একদলীয় কমিউনিস্ট শাসন যখন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল, হোনেকার তখন মস্কোয় পালিয়ে চিলির দূতাবাসে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু তারাও বেশিদিন সেখানে রাখল না তাঁকে। দরজা খুলল না অন্য কোনও দূতাবাসের। শেষমেষ বার্লিনে ফিরে ভিখিরির মতো মারা গেলেন একদা দোর্দণ্ডপ্রতাপ এরিক হোনেকার।

ওদিকে গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান দাবিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করে, জনতার আদালতে অপরাধী হলেন রোমানিয়ার স্বৈরাচারী কমিউনিস্ট খলনায়ক চেসেস্কু। ফায়ারিং স্কোয়ার্ডের গুলিতে প্রাণ দিতে হলো তাঁকে।

নিকিতা ক্রুশেভ দেখে যেতে পারলেন না (মৃত্যু-১৯৭১ সালে), ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো পুনরাবৃত্তি হলো তাঁরই সোভিয়েত দেশে। গর্বাচভ-ইয়েলেৎসিনের গণতান্ত্রিক সংস্কার রুখে দেওয়ার জন্য কুচক্রী কট্টরপন্থী কমিউনিস্টরা জরুরি অবস্থা জারি করে সোভিয়েত ইউনিয়নে সামরিক শাসন কায়েম করল। তাদের নেতাদের মধ্যে ছিলেন সেনাপ্রধান মার্শাল আক্রামাইয়েভ,

ইতিহাস থেকে কোনও শিক্ষা নেয়নি বর্তমান রাজ্য সরকারও। যদি নিত তাহলে রাজ্যে শাসকদল তাদের দুধেল গোরু নামক সমাজ বিরোধী ও সন্ত্রাসীদের সাহায্যে বিভিন্ন গ্রামের শয়ে শয়ে শান্তিপ্রিয় মানুষদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে, ধনসম্পদ লুঠ করে, নারী নির্যাতন করে মানুষকে পথে বসানোর ব্যবস্থা করত না।

অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী রবিস পুগো প্রমুখ। পুগো প্রথমে গুলি করে স্ত্রীকে হত্যা করলেন। পরে আত্মহত্যা করলেন নিজের মাথায় গুলি চালিয়ে। গলায় দড়ি দিলেন মার্শাল আক্রামাইয়েভ। মাত্র ৯৬ ঘণ্টার লড়াইয়ে পরাজিত হলো কমিউনিস্ট স্বৈরাচারী গোষ্ঠী।

জরুরি অবস্থায় ইন্দিরা গান্ধী সিভিল সার্ভেন্টদের সমস্ত প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা হরণ করেছিলেন। এমনকী, সেই সময়কার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারি আইসিএস নির্মলকুমার মুখার্জি, জয়প্রকাশ নারায়ণ ও মোরারজি দেশাইয়ের গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে মৌখিক ও লিখিত মত প্রকাশ করার জন্য ১৯৭৫-এর ২৪ জুনের রাত পোহানোর আগেই তাকে বদলি করা হয়েছিল। এরপর সেটা ঘটেছিল সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, সেটা ছিল সিভিল সার্ভেন্টদের নীরব প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ। এই প্রতিবাদ ও বিদ্রোহই ভাষা পেয়েছিল ১৯৭৭ সালের মার্চের নির্বাচনে। স্বৈরাচারী ইন্দিরা গান্ধীর পতন হয়েছিল।

যে সন্ধ্যায় নির্বাচনী ফল বের হলো, অত্যাচারী সঞ্জয় গান্ধী দিল্লি থেকে পালিয়ে গেলেন। কয়েক লক্ষ মানুষের জনরোষ তখন তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে ইন্দিরা গান্ধীর বাড়ির পথে ধাবমান। সিভিল সার্ভেন্টরা তাদের নিরপেক্ষ তরবারি নিয়ে এগিয়ে এলেন না। কারণ, ইন্দিরা গান্ধী তো তাদের তরবারি আগেই কেড়ে নিয়েছেন।

Power comes out from the barrel of the gun— এই তত্ত্বটিও সেদিন কোনও কাজে লাগেনি। কাজে লেগেছিল কেবলমাত্র জয়প্রকাশ নারায়ণের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা।

১৪ মার্চ ২০০৭ পুলিশের পোশাকপরা সিপিএমের গুন্ডাদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ নন্দীগ্রামে গণহত্যা করেছিল। আহত হয়েছিল বহু, নিখোঁজ বহুতর। ১০ নভেম্বর পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা পুনরায় ঠাণ্ডা মাথায় সিপিএমের হার্মাদ-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে কুখ্যাত গুন্ডা ও ডাকাতদের নিয়ে পুনরায় নন্দীগ্রামে হত্যালীলা চালাল। এই হত্যালীলা ১৪ মার্চের বর্বরতাকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল।

১৯ নভেম্বর নন্দীগ্রাম নিয়ে আলোচনার দাবিতে সংসদ অচল করল বিজেপি। ওইদিন নন্দীগ্রামের ঘটনাকে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে মুখ খুললেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান তথা সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এস রাজেন্দ্রবাবু। তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন— 'নন্দীগ্রাম গণহত্যা গুজরাটের গোধরার নরসংহারের মতোই গোটা দেশ ও জাতির মুখে ভয়াবহ ক্ষত। নন্দীগ্রামের পরিস্থিতি ভয়ংকর।' ...দেশের অগণিত মানুষের মতোই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নন্দীগ্রামের সন্ত্রাসে মর্মাহত ।

কলকাতা হাইকোর্ট নন্দীগ্রামে কৃষকদের ওপর আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গালে কষে এক থাপ্পড় মেরেছিল। হাইকোর্টের ভাষায়— 'A tite slap on the face of W.B. Government.' রাজ্যপাল বলেছিলেন 'হাড়হিম করা ঘটনা।' '...এনাফ ইজ এনাফ'।

যদি স্বৈরাচারী শাসক ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিত তাহলে সিঙ্গুর- নন্দীগ্রামের ঘটনার

চার বছর পর ২০১১ সালের নির্বাচনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ত না স্বৈরাচারী সাম্রাজ্য। কী হয়েছিল তা আমাদের প্রত্যেকের মনে এখনও গেঁথে আছে। সে বিষয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু দু'বছর যেতে না যেতেই নতুন সরকার ইতিহাস ভুলে গিয়ে উল্লেখিত

একের পর এক নারী নির্যাতন, অপহরণ, ধর্ষণ, ধর্ষণের পর পুড়িয়ে হত্যা, বিরোধী দলের সাধারণ কর্মী থেকে বিধায়ক পর্যন্ত সকলকে হত্যা এবং ঝুলন্ত দেহের মিছিল দেখা যেত না। সবচেয়ে আশ্চর্য হলো, কোনো ক্ষেত্রেই অপরাধীরা ধরা পড়ে না বা ধরা পড়লেও তাদের কোনো শাস্তি হয় না। অন্যদিকে এমনই তোষণ চলছে যে হিন্দুরা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নামে জয়ধ্বনি দিলেও তাকে জেল খাটতে হচ্ছে। রাজ্যে একের পর এক বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে সঙ্গে আলকায়দার মতো জঙ্গিরা নির্বিঘ্নে আস্তানা গাড়লেও রাজ্যের গোয়েন্দাকুল তা জানতে পারে না। আবার এনআইএ যদি সেসব জঙ্গিদের ধরে তাহলে রাজ্যের ডিজি প্রশ্ন তোলেন— রাজ্যকে না জানিয়ে কেন জঙ্গি ধরার জন্য অভিযান করা হলো?

এসমস্ত কারণে কয়েকদিন আগে দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে রাজ্যপালের বৈঠকের সময় রাজ্য প্রশাসন সম্পর্কে রাজ্যপাল অনাস্থা প্রকাশ করে এসেছেন। তিনি বলেছেন—'পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে।' দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্যপাল বলেছেন--- 'পশ্চিমবঙ্গে চরম নৈরাজ্য চলছে। আমলাতন্ত্রের রাজনীতিকরণ হয়ে গিয়েছে।' যা গিয়ে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের গুঞ্জন শুরু হয়েছে। প্রথমে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর, তারপর রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ এবং এবার কৈলাস বিজয়বর্গীয় বললেন, 'পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যেভাবে অবনতি হয়েছে, তাতে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন দাবি করাটা অযৌক্তিক নয়। এবং সেদিকেই একটু একটু করে এগোচ্ছে রাজ্য।' কিন্তু রাজ্যের বহু সাধারণ মানুষ বলাবলি করছেন— রাষ্ট্রপতি শাসনের বদলে এখনই রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করা উচিত। নচেৎ আগামী বছর ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত শাসকদলের গুন্ডা ও পুলিশের হাতে আরও বহু বিরোধীদলের কর্মী-সমর্থকদের হত্যা কেউ আটকাতে পারবে না এবং সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে ভোটও দিতে পারবেন না।

পশ্চিমবঙ্গবাসী আশা করে এরাজ্যে আর কোনো মানুষকে হত্যা করা হবে না, নারী নির্যাতন হবে না, গৃহদাহ হবে না। প্রশাসন ও পুলিশকে তাদের নিরপেক্ষ তরবারি ফিরিয়ে দিয়ে রাজ্যে সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে তোলা হবে, সেই আশায় আজ সকলেই চেয়ে আছে। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**



মোদীজীর সংকল্প দেশকে আরও শক্তিশালী করবে

ডাঃ আর এন দাস

মাত্র এক বছরের ব্যবধানে দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ২০১৯-এর ৫ আগস্ট কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা রদ, আর ২০২০-র ৫ আগস্ট অযোধ্যায় রামমন্দিরের শিলান্যাস। ভারতকে দেওয়া বিজেপির দুটি প্রতিশ্রুতি পূরণ। প্রতিটি নির্বাচনী ইস্তেহারেই উল্লেখিত হয়েছিল এই দুই প্রতিশ্রুতি। আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ আইন, 'অভিন্ন নাগরিক সংহিতা' এবং 'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ'। সুতরাং কাজ এখনো অনেক বাকি।

দিল্লিতে বাঙ্গালি বাজারের সামনের রাস্তাটি এখনও উজবেকিস্তান থেকে আসা তৈমুর ও চেঙ্গিস খানের বংশধর, বর্বর বিদেশি আক্রমণকারী ও মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের (১৪৮৭-১৫৩০) নামাঙ্কিত— বাবর রোড। তাকে পরিবর্তিত করে '৫ আগস্ট রোড' রাখার দাবি উঠেছে বিভিন্ন রাষ্ট্রবাদী দলের কাছ থেকে।

ভারতের সংবিধান এক মহান নীতিনির্ধারক সংহিতা। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৬-৫১ পর্যন্ত নীতিনির্দেশক সিদ্ধান্ত। ৪৪ অনুচ্ছেদে 'সমান নাগরিকতা'র কথা উল্লেখিত হয়েছিল। ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০ সালে সংসদে গৃহীতও হয়। সে সময় রাজ্যগুলির উপর এর অনুগমনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। বেশিরভাগ রাজ্যই সংখ্যালঘু ভোটের লালসায় হিন্দুদের স্বার্থহানি করে প্রাদেশিক সরকার ও তাদের ভ্রষ্ট, লোভী ও স্বার্থান্বেষী নেতারা তথাকথিত সংখ্যালঘু তোষণ এবং ভোট ব্যাঙ্কের মোহে দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে বিঘ্নিত করে এবং জনবিন্যাসের অসামঞ্জস্য ঘটিয়ে দেশকে আজ আবার বিভাজনের প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। সংবিধানের ৩০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে হিন্দুরা বেদ, পুরাণ, গীতা স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে পড়াতে পারবে না কিন্তু মুসলমানরা কোরান ও হাদিস পড়াতে পারবে মাদ্রাসাগুলিতে। ৩০ অনুচ্ছেদ হচ্ছে বৈষম্যের চরম উদাহরণ। এখানে বলা হয়েছে, ধর্ম ও ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি তাদের পছন্দমতো শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও প্রচারপ্রসার করার পূর্ণ অধিকার পাবে রাজ্য সরকারেরই সাহায্যে। অথচ, নন-মাইনোরিটি মানে হিন্দুরা সরকারি বা ব্যক্তিগত খরচেও স্কুল-কলেজে হিন্দুধর্ম বিষয়ক কিছু পাঠ্যসূচিতে আনতে পারবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের অবজ্ঞা করে, ভারতকে মাইনোরিটিদের দেশ হিসেবেই দেখানো হয়েছে সর্বদা। আজ এতদিনের ভুল শোধারানোর সময় এসেছে। ইউনিফর্ম সিভিল কোড মানে, এক দেশ, এক আচর-বিচার, রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, আহারবিহার, ভাষা, ধর্ম ও বিবাহপদ্ধতি— এমনটি কিন্তু নয়। যদিও স্বজনপোষণকারী ও সংখ্যালঘু ভোটভিখারি বিরোধীপক্ষের নেতারা ৭০ বছর ধরে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছেন। যেমনটি ৩৭০ ধারা, সিএএ, রাফেল কিংবা কৃষিবিলের বিরোধিতা করে ও ভারতবিরোধী তত্ত্বের সঙ্গে মিলে ভারতের উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করছেন।



মোদীজীর পূর্বে ভারতে আর কোনো নেতা এমন সময়সীমার মধ্যে লক্ষ্য স্থির করার শপথ নেননি।

প্রতিটি নির্বাচনের সময়েই বিজেপি নেতারা আমেরিকার মতো নির্বাচনী ব্যয়ভার কমানো ও স্বচ্ছতার জন্য 'ওয়ান নেশন, ওয়ান ইলেকশন', এক রেশনকার্ড, সংবিধান, পাওয়ার গ্রিড ও সারাদেশে জিএসটি রূপ ট্যাক্সেশন পদ্ধতির কথা উচ্চস্বরে আউড়েছেন কিন্তু বিরোধীদের প্রশ্ন, এরকম এক বিবিধতাপূর্ণ বিশাল দেশে এটা করা কি এত সহজ বা সম্ভব হবে? কানাডা, আমেরিকা, ব্রাজিল, চীন এবং রাশিয়ার মতো বিশাল দেশগুলি কীভাবে আছে? স্বাভাবিক প্রশ্ন। কিন্তু চীন ছাড়া আর সমস্ত দেশেই আছে আমাদের মতো গণতন্ত্র। একনায়কতন্ত্রী চীনে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোই শেষ কথা। অন্য দেশগুলিতে ভারতের মতো এত বিভিন্নতা নেই। চীন ছাড়া আর কোনো দেশেই এত বিশাল

জনসংখ্যা নেই। 'অতিথি দেব ভব', 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্ব সন্তু নিরাময়ঃ', এবং 'অহিংসা পরম ধর্মের' দেশে সংখ্যালঘু মুসলমানরা নির্বিবাদে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ওপর অত্যাচার করতে পারে। অনন্য সহ্যশক্তির এই দেশ ভারতবর্ষ। এদেশে বাকস্বাধীনতার নামে বরখাদত্ত, রাজদীপ সরদেশাই, কানহাইয়া কুমার এবং ওমর-খালিদদের টুকরে টুকরে গ্যাঙ্গের 'দেশের বরবাদি তক জং জারি রাখা'র স্লোগান সংবিধানসিদ্ধ। এদেশে লালু-অখিলেশ যাদবরা হজ-হাউস করেন। মমতার মতো ভ্রষ্ট লোভী নেতা হাইকোর্টকে কাঁচকলা দেখিয়ে ইমাম-ভাতা এবং মুয়াজ্জিনদের মাসোহারা দিতে পারেন।

আমাদের সংবিধানে এমন ধারা আছে, যা ভবিষতে পরবর্তী প্রজন্মের প্রয়োজনে সংসদে আলোচনার মাধ্যমে, কোর্টের আইন মেনে, প্রতিটি অনুচ্ছেদেরই ব্যাখ্যা ও বিস্তার সম্ভব হবে। আমেরিকায় ১৭৮৭ সালে ৪ পাতার সংবিধানে আর্টিকেলের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭টি। ভারতে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ১৪৬৩৮৬টি ইংরেজি শব্দের ৩৪৫টি শিডিউলযুক্ত সংবিধান ৪০ বারের বেশি সংশোধিত হয়েছে।

স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট, ট্রাইবাল, সংখ্যালঘু সংরক্ষণের বিলোপ অবশ্য করণীয়। মুসলিম পার্সোনাল 'ল, ওয়াকফ বোর্ডের উচ্ছেদ অনিবার্য। কিন্তু ভারতের প্রবীণ সাংবাদিক, আইনজ্ঞ, পাকিস্তান ও পশ্চিমি দেশগুলির পে-রোলে থাকা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা এগুলি বিলোপের কথা উঠলেই রে-রে করে ওঠেন।

১৫ আগস্টের ভাষণের পর রাষ্ট্রবাদী প্রবীণ সাংবাদিক শেষাদ্রি চারীর কথা কমিউনিস্ট সংবাদমাধ্যম 'দ্য প্রিন্ট'-এ প্রকাশিত হয়। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে 'ইউনিফর্ম সিভিল কোড ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর মোদী সরকার গোপনে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। লিবিয়ার কুখ্যাত গদ্দাফি বলেছিলেন, '৫০ মিলিয়ন মুসলমান ইউরোপকে একদিন ইসলামিক মহাদেশ পরিণত করবে'।

২০২৫ বিজেপির এক গুরুত্বপূর্ণ



সময়সীমা। প্রতিশ্রুতি দেওয়া অসম্পূর্ণ কাজগুলি সম্পূর্ণ করার সুবর্ণ সুযোগ। বিজেপি ১৯৮০ সালে গঠিত হয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ১৯৮৪-তে। সেসময় লোকসভায় দুটি আসন পায়। এখন রাজ্যসভায় ৫৪৩টির মধ্যে ২৮২টি সাংসদ-সহ বিজেপির ১৮ কোটি ভোটার। এনডিএ-র ১১৩টির মধ্যে বিজেপিরই ৮৬টি সদস্য। বিপক্ষের সমস্ত নেতাই আজ মোদীজীর রণনীতিতে পরাস্ত ও শঙ্কিত। আপোস-মীমাংসা আজ চরম সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে।

নাগরিকদের সামাজিক ও আর্থিক সুবিধা সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণে রাজ্য সরকারের ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপ্যাল ও সাংবিধানিক আইনে নিয়মাবলীর পরিবর্তন এমনকী বাতিল করার কথাও আছে। সংসদীয় সমিতি এবং ২০১৮ সালের আইন সংক্রান্ত কমিটিও ইউনিফর্ম সিভিল কোড ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইনে রাজি হয়নি। বিজেপিকে এই দুটি অত্যন্ত জরুরি সমস্যার সমাধান সংবিধানের পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেই করতে হবে।

নরেন্দ্র মোদী সিএএ, রেরা, এফসিআর অ্যাক্ট, রামমন্দির, ৩ কোটি আবাস, তিন তালাক বাতিল, কম মুদ্রাস্ফীতি, ১৫টি নতুন এআইআইএমএস, ৭টি আইআইএম, ৮টি আইআইটি, ৩৫টি নতুন এয়ারপোর্ট এবং ১.৮ লক্ষ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের পাকারাস্তা তৈরি করে মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। উজ্জ্বলা মিশনে ৮ কোটি গ্যাসসিলিন্ডার দিয়ে গ্রামীণ মহিলাদের কষ্ট লাঘব করেছেন। মোদীজীর আহ্বানে সোয়া কোটি ভারতীয় স্বেচ্ছায় গ্যাস- সাবসিডি'ছেড়ে দিয়েছেন। স্বচ্ছ ভারত মিশন যোজনা ৯ কোটি শৌচালয় নির্মাণ করে ২০২০-র শুরুতেই ৬টি রাজ্যে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৭০৬টি শহর ও ৬০৩১৭৫টি গ্রামে ভারতকে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছে।

ভারত আজ এশিয়ায় দ্বিতীয় বৃহত্তম সৌরশক্তি , সারাবিশ্বে দ্বিতীয় মোবাইল উৎপাদক ও ৪র্থ বৃহত্তম গাড়ির বাজার গড়তে পেরেছে। এগারোতম স্থানে থাকা 'আয়ুষ্মান ভারত' আজ বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্যসেবা সংস্থা। আজ জিডিপি-র নিরিখে পৃথিবীর তিনটি বৃহৎ অর্থব্যবস্থার প্রথম আমেরিকা (২১.৫ ট্রিলিয়ন ডলার), দ্বিতীয় চীন (১৪.১৪) এবং তৃতীয় জাপান (৫.৭৫) ও জার্মানির (৪.৪) পর ভারত (৩.২) ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে পিছনে ফেলে বিশ্বের পঞ্চম স্থানে পৌঁছেছে।

চীন ও পাকিস্তান আজ কোণঠাসা। সন্ত্রাসের ঘটনা অনেক নিয়ন্ত্রণে। সংযুক্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীন ও পাকিস্তানের পরাজয়, রেকর্ড ভোটে জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্যপদ, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার একজিকিউটিভ বোর্ডে সভাপতির পদ, বিশ্ব

যোগদিবসে ১৯৩টি দেশকে সম্মিলিত করার সম্মান— এগুলি মোদীজীই এনে দিয়েছেন এই ৬ বছরে।

বিজেপি ও কংগ্রেস জাতীয় স্তরের দুটি প্রধান দল। দুটি দলই নির্বাচনী ইস্তেহারের নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। দুই দলের প্রতিশ্রুতিগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেই ভোট দেওয়া উচিত। বিজেপি রাষ্ট্রবাদ, ভৌগোলিক অখণ্ডতা, সামরিক শক্তির উত্থান, নাগরিক সুবিধা এবং সার্বিক বিকাশের প্রতিজ্ঞা করে নির্বাচনী রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হয়। মোদীজীর দূরদৃষ্টিতে ইজরায়েলি সহযোগিতায় অসম, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও মণিপুরে 'স্মার্ট ফেন্সিঙ্গ' দ্বারা ভারত ২০২৪ সালের মধ্যেই অনুপ্রবেশ প্রতিরোধে সক্ষম হবে। মোদীজীর অঙ্গীকার ২০৪৭-তে ভারত উন্নতশীল দেশ থেকে উন্নততম দেশের পর্যায়ে পৌঁছাবে।

মোদীজীর পূর্বে ভারতে আর কোনো নেতা এমন সময়সীমার মধ্যে লক্ষ্য স্থির করার শপথ নেননি। ২০১৯-এর নির্বাচনী ইস্তেহারে মোদীজী বলেন, রাষ্ট্রবাদ আমাদের প্রেরণা, বিকাশ আমাদের দর্শন ও সুশাসন আমাদের মন্ত্র। ২০২২-এ ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ পূর্ণ হলে বিজেপির ইস্তেহারে উল্লেখিত ৭৫টি সংকল্পকে সম্পূর্ণ করার শপথ আছে। সন্ত্রাসবাদের উপর বিজেপির জিরো টলারেন্স নীতি। সেজন্য সুরক্ষাবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করার সংকল্প নিয়েছেন। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' নীতিতে সামরিক উপকরণ, যেমন এ.কে ২০৩ স্বয়ংক্রিয় রাইফেল নির্মাণের কারখানাটি আমেটিতে হয়েছে।

জেহাদি ও নকশাল হামলা পূর্বের তুলনায় কমেছে। মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় উন্নয়ন ও বিকাশের গতি তীব্রতর হয়েছে। ভারতের অভিন্ন অঙ্গ জম্মু-কাশ্মীরের বিকাশ ভারতীয় জনসঙ্ঘের (১৯৫১-৭৭) সময় থেকেই মুখ্য বিচার্য বিষয় ছিল। সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে ৩৭০ ধার বাতিল হলেও কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ঘরে ফেরানো, মহিলাদের সংরক্ষণ, ডোগরা ও অন্যান্য জনজাতিদের নাগরিকতা প্রদান, জাতিধর্ম-ভিত্তিক বৈষম্য দূর করা এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার স্থাপন করানোর কাজ এখনও বাকি আছে।

'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায়' ২০২২ সালের মধ্যেই প্রত্যেক নাগরিকের বাসোপযোগী পাকা ঘর, পাইপের মাধ্যমে স্বচ্ছ পানীয় জল, শৌচালয়, বিদ্যুতের বাতি ও হাই স্পিড অপ্টিক্যাল ফাইবারে প্রতিটি গ্রামে ইন্টারনেটের সুবিধা এখনও বাকি আছে।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বাঁচানোর গুরুদায়িত্বও বিজেপিকে নিতে হবে। সর্বোচ্চ আদালতের রায় মেনেই রামমন্দির নির্মাণ অভিযান মোদীজী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই নিষ্পন্ন করেছেন। এখনও বাকি আছে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান, কাশী বিশ্বনাথ মন্দির এবং শবরীমালার বিবাদ নিষ্পত্তি। কেরলের ওই মন্দিরে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও মুসলমান শাসিত সরকারের কাছে হিন্দুর আস্থা, বিশ্বাস, পরম্পরা ও পূজাপদ্ধতির কোনো মূল্যই নেই। বিজেপির উচিত আইনানুগ প্রক্রিয়ায় ওই গম্ভীর সমস্যার আশু সমাধান করা।

অবিলম্বে সমান নাগরিক সংহিতা জারি করে মহিলাদের সমান মর্যাদা এবং লিঙ্গ-বৈষম্যের অবসান করতে হবে। প্রতিটি কৃষকের জন্য ঋণ, কৃষিবিমা, পেনশন চালু করার লক্ষ্যে বিজেপি অনেকটাই এগিয়ে আছে। ষাটোর্ধ ক্ষুদ্র কৃষকদের পেনশন দেওয়া, 'কিষান সম্মাননিধি' প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে। বছরে কৃষকদের ৬০০০ টাকার অনুদান, ৫ বছর অবধি সুদহীন ১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। 'শ্রমজীবী ও মানদান প্রকল্পের' মাধ্যমে ষাটোর্ধের ছোটো শ্রমিক, দোকানদার এবং ব্যবসায়ীদের পেনশন দেওয়ার সংকল্প আছে। মোদীজী শিক্ষার উপর ১ লক্ষ কোটি খরচ করে মেডিক্যাল, ম্যানেজমেন্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আইন কলেজগুলিতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাছাড়া দেড় লক্ষ স্বাস্থ্য ও সুস্থতা বিষয়ক ক্লিনিক খোলার সংকল্প নেওয়া হয়েছে।

বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচন একই সময়ে করিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাজ এবং খরচ কমিয়ে স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপর জোর দেওয়ার জন্য 'বিপক্ষের অনুমোদন' অভিযান চালানোর সংকল্প নেওয়া হয়েছে। বিধানসভা ও লোকসভায় মহিলা সদস্য ও সাংসদের ৩৩ শতাংশ পূরণের কাজও বাকি আছে। ২০২২ সালে 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্পের মাধ্যমে গঙ্গাকে স্বচ্ছ করার বিরাট পরিকল্পনা মোদীজী করেছেন। জলপরিবহণের মাধ্যমে কম সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে বারাণসী থেকে কলকাতায় খিদিরপুর পোর্টে মাল সরবরাহ হচ্ছে। স্বতন্ত্র 'জলশক্তি' মন্ত্রালয় খোলা হয়েছে।

সেনাবাহিনীর ওআরওপি ৪০ বছর ধরে বিতর্কিতক অবস্থায় ঠাণ্ডা ঘরে পড়েছিল। বিজেপি ক্ষমতায় আসা মাত্র ১১ হাজার কোটি টাকার বকেয়া পেনশন মিটিয়ে দেয়। কংগ্রেস সংখ্যালঘু ভোট হারানোর ভয়ে রামমন্দির সমস্যাকে জিইয়ে রেখেছিল। বিজেপি প্রতিবেশী দেশগুলির অত্যাচারিত নাগরিকদের ভারতে শরণার্থী রূপে নয়, সম্মানের সঙ্গে নাগরিকতা দিলে কংগ্রেস ও তার লেজুড়ে পার্টিগুলির তীব্র বিরোধিতা মোদীজীকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি।

বিজেপিকে 'ন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন অব সিটিজেনশিপ' আইনের সাহায্য নিয়ে মুসলমান অনুপ্রবেশ রোধ করতেই হবে ২০২৪ সালের মধ্যেই। কংগ্রেস ও তার 'বি'-টিমগুলি বিনাপরিশ্রমে ফ্রিতে রেশন, সাইকেল, টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি দিয়ে প্রতিটি নির্বাচন জিতেছে। বিজেপি চায় আত্মনির্ভর ভারত।

সক্ষম, স্বাভিমানী ও স্বনির্ভর ভারতবাসীকে স্কিল-ইন্ডিয়া, মেক-ইন-ইন্ডিয়া প্রকল্পে উদ্বুদ্ধ করে মোদীজী আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণ করতে চাইছেন। বিজেপির সংকল্পপত্রে নতুন শিল্পোদ্যোগ ও কলকারখানা খোলার কথা বলা হয়েছে। তরুণ ও নতুন উদ্যোগীদের বিনা জামিনেই ৫০ লক্ষ টাকা ঋণের প্রতিশ্রুতি আছে। বিজেপি আগামী ২০২৪ সালের মধ্যেই ৫০ হাজর স্টার্ট আপ স্থাপন ও বেকারত্বের সমাধানে গান্ধীজীর 'গ্রাম-স্বরাজ্যের' যোজনাকে বাস্তবায়িত করতে চলেছে। বিজেপি নাগরিক 'সক্ষমতাতে' বিশ্বাস করে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর বহুবিধ সংস্কার কর্মগুলি অবশ্যই প্রশংসনীয়



অরবিন্দ পানাগড়িয়া

প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ পল স্ট্রেটেন বলেছিলেন বিদ্যোৎসাহীরা তাঁদের তোলা প্রশ্নকে সর্বদা তীক্ষ্ণ ও অভ্রান্ত করার চেষ্টায় রত থাকেন, এটিই তাঁদের এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা। অন্যদিকে রাজনীতিবিদরা গোটা বিষয়টিকে কিছুটা এলোমেলো করে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করেন।

কিছুদিন আগে আমি সরাসরি এই কলমে একটি প্রশ্ন তুলেছিলাম যে, নরেন্দ্র মোদী তাঁর সংস্কার প্রকল্পগুলির মাধ্যমে কি নরসিমহা রাও, অটলবিহারী বাজপেয়ী বা মনমোহন সিংহের সমকক্ষ হয়ে উঠেছেন? এর উত্তর খুঁজতে গেলে উল্লেখিত প্রধানমন্ত্রীদের এই সংক্রান্ত রেকর্ড ও পরিসংখ্যানের তুল্যমূল্য আলোচনা জরুরি। প্রথমেই বলে রাখি প্রশ্নটির উত্তর 'হ্যাঁ' বলেই আমার মত।

আমার প্রশ্নের উত্তরে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও উকিল পি চিদাম্বরম তাঁর মজ্জাগত স্বভাব অনুযায়ী আমার মতের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু স্বপক্ষে কোনো যুক্তি না দেখিয়ে প্রশ্নটিকেই ঘুরিয়ে দিয়েছেন। পাল্টা প্রশ্ন করেছেন কোন প্রধানমন্ত্রী সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক বৃদ্ধি দাবিদার হতে পারেন? আর সেই বৃদ্ধির নিরিখে মনমোহন সিংহই অবিসংবাদিতভাবে চূড়ান্ত বৃদ্ধির বছরগুলির রূপকার হিসেবে সংস্কারেও স্বাভাবিকভাবে সেরা। এই সূত্রে তিনি মোদীকে প্রথমে তদানীন্তন জিডিপি বৃদ্ধির মাত্রা ছুঁতে চলেছেন তবেই তাঁর অর্থনৈতিক সংস্কারকের দাবি বিবেচনাধীন হতে পারে।

হায়! কে সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সংস্কার করেছেন আর কার আমলে বৃদ্ধি সর্বোচ্চ হয়েছে দুটি সম্পূর্ণ আলাদা প্রশ্ন। তার ফলে চিদাম্বরমের উত্তরে মোদীর পক্ষে আমার মতের বিন্দুমাত্র হেরফের হয়নি। মত পরিবর্তন করতে গেলে চিদাম্বরমকে মনমোহনের সংস্কার কর্মের স্বপক্ষে বহু অকাট্য প্রমাণ দিতে হবে।

যাইহোক, চিদাম্বরমের তোলা প্রশ্নটিকে আরও ভালো করে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা দরকার। হ্যাঁ, কে সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন? এই সূত্রে প্রথম বিন্দু হচ্ছে

> **২০২৪ সালে যে জোটই কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসুক না কেন তারা একটি সঠিক দিশায় দ্রুত ধাবমান বলিষ্ঠ অর্থনীতির উত্তরাধিকার পাবে। অবশ্য যদি না তারা গৃহীত সংস্কারগুলি বাতিল করে দেয়।**

একজন প্রধানমন্ত্রীর আমলে খাতায় কলমে কতটা বৃদ্ধি হয়েছিল ও বৃদ্ধির কত পরিমাণ অংশ তিনি যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। এই দুটিও নিশ্চিতভাবে আলাদা প্রশ্ন। আমার জ্ঞানগম্যি অনুযায়ী বুঝেছি চিদাম্বরম এই দুটিকে এক করে ফেলেছেন। যার ফলে তাঁর উত্তর এসেছে মনমোহন সিংহ। তর্কের খাতিরে আমরা চিদাম্বরমের খেলার নিয়ম অনুযায়ী ধরে নিচ্ছি তাঁর সময়ে যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটেছিল তাই সকলের কাছে পৌঁছেছিল সকলের একই সময় লেগেছিল ও অর্থনীতির সমস্ত পথে বিকশিত হয়েছিল। এই নিয়মে মনমোহন তাঁর ১০ বছরের শাসনকালে গড়ে ৭.৭ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। মোদী তাঁর চলতি ৬ বছর অবধি ৬.৮ শতাংশ। বাজপেয়ী ৬ বছরে ৫.৯ শতাংশ ও নরসিমহা রাও তাঁর ৫ বছরে ৫.১ শতাংশ। চিদাম্বরমের সংজ্ঞা অনুযায়ী নরসিমহা রাও সর্বাপেক্ষা খারাপ সংস্কারক ছিলেন ও সরল হিসেবে মনমোহন সর্বাপেক্ষা সফল ছিলেন। এখানে কিন্তু সময়সীমাটিকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করা হলো। সবকিছু তো তাঁর হিসেব মতো ও গড় নিয়মে চলে না। তাহলে ১০ বছর সময় পেলে নরসিংহা ১০.২ শতাংশ বৃদ্ধি হয়তো দেখাতে পারতেন।

চিদাম্বরমের সংজ্ঞা অনুযায়ী অর্থনৈতিক বৃদ্ধিই সংস্কারের সাফল্য নির্ণায়ক হলে নরসিমহা রাওকে সংস্কারকের তালিকা থেকেই বাদ দিয়ে দিতে হয়। এটি হবে একটি চরমতম অবাস্তব ও অন্যায্য মূল্যায়ন। রাওয়ের সময় বৃদ্ধির হার কম ছিল তার অর্থ

কখনই এই নয় যে তিনি ভালো সংস্কারক ছিলেন না। বরং সম্পূর্ণ উলটো। তিনিই ভারতীয় অর্থনৈতিক সংস্কারের পুরোধা পুরুষ। তিনি যে সমস্যাসঙ্কুল অর্থনীতির হাল ধরেছিলেন তার পরিণতিতে তাঁর প্রথমবছরের বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ১.১ শতাংশ। অথচ এই নিকৃষ্টতম বৃদ্ধির হারে তাঁর কোনো ভূমিকা ছিল না। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর পূর্বসূরীদের হাত থেকে এই ডুবন্ত অর্থনীতি পেয়েছিলেন। ১৯৯১ সালে যাঁরা দেশে অর্থনীতিতে আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যালেন্স অব পেমেন্টে সমস্যা পর্যন্ত ডেকে এনেছিলেন। রাজস্ব খাতে বিরাট ফারাক তৈরি হয়েছিল। বৈদেশিক ঋণের সুদ ছিল পাহাড়প্রমাণ তার ফলে অর্থনীতিতে ধ্বস নেমেছিল। টাকা মেটাবার অবস্থা প্রায় ছিল না। অন্যদিকে তাঁর বিদায়ের শেষ বছরে ৭.৬ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটা একটি সর্বোচ্চ অর্থনীতি উত্তরসূরীকে তিনি হস্তান্তর করে যান।

এই পরিপ্রেক্ষিতে চিদাম্বরম যাকে সেরা সংস্কারক হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন সেই মনমোহন সিংহের সময়কালটি দেখা দরকার। ২০০৪ সালে যখন অটলবিহারী বাজপেয়ী নির্বাচনে হেরে গেলেন তখন তিনিও মনমোহনকে ২০০৪ সালে ৭.৯ শতাংশ অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটা অর্থনীতি হাতবদল করে যান। মনে রাখতে হবে এই বড়ো রকমের বৃদ্ধি বাজপেয়ীর শেষ চার বছরে নেওয়া লাগাতার সংস্কার প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি।

এখন যে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন ২০০৪-০৫ অর্থবর্ষে ৭.৯ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটানোর জন্য মনমোহন কী কী সংস্কারের কাজ করেছিলেন? এর পরের বছরগুলিতে বৃদ্ধি আরও বেড়েছিল তার মূলেই বা ছিল কোন কোন সংস্কারের যাদুদণ্ড। চিদাম্বরমের মন্ত্রীসভার এক সহকর্মীর সঙ্গে একটি পাবলিক বিতর্ক সভায় আমি তাঁকে মনমোহনের নেওয়া মাত্র তিনটি সংস্কার কর্মের নাম করতে বলেছিলাম যেগুলি তাঁর আমলের এই উচ্চ জিডিপি বৃদ্ধির মূলে কাজ করেছে। কোনো যথোপযুক্ত জবাব না পাওয়ায় আমি আদৌ অবাক হইনি। একই ধারা অনুসরণ করে চিদাম্বরম প্রশ্নের উত্তর গোলতাল পাকিয়ে দিয়ে বলেছেন মনমোহনই তাঁর সময়ে সেরা অর্থনৈতিক সংস্কারক।

অবশ্যই মনমোহনের বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্য একটা বিষয়ে যে তাঁর পূর্বসূরী বাজপেয়ীর করে যাওয়া সংস্কার বিধিগুলিকে তাঁর নিজের কংগ্রেসের একটি Pressure of group ও বামপন্থী জোট সমর্থকদের চাপের মুখে নতি স্বীকার না করে বাতিল করার পথে না হাঁটা। এটি তাঁর প্রথম ৫ বছরের সময়কালের কথা। এর ফলে তিনি অর্থনৈতিক বৃদ্ধির যে উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন তা ধরে রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তাঁর দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি ওই চাপের কাছে মাথা নত করে সংস্কারের গতিমুখ শ্লথ করে দেন।

অজস্র ভুল নীতি গ্রহণ, রাজস্ব খাতে বেলাগাম ঢিলেমি ও শৃঙ্খলার অভাব, পুরনো হিসেব ধরে জটিল কর ব্যবস্থা, বারবার ব্যাঙ্কের সুদে বৃদ্ধি, ২০১৩ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন চালু করা থেকে সরকারি ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কগুলিকে অযোগ্য ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ ও সর্বোপরি শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে পরিবেশ ছাড়পত্র পেতে দীর্ঘসূত্রিতা তাঁর সরকারকে সম্পূর্ণ অকর্মণ্য করে তোলে।

এতো বহুমুখী ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্তের ফলে ২০১৩ সালের মাঝামাঝি একটি অর্থনৈতিক সমস্যা-সঙ্কুল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। অগ্রগণ্য অর্থনৈতিক পত্রিকা The economist পত্রিকায় লেখা হয় 'It is widely agreed that India is in worst economic bend since 1991' (১৯৯১-এর পর ভারত চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে) এর পরিণতিতে মনমোহন তাঁর উত্তরাধিকারীকে একটি দুর্বল অর্থনীতি উপহার দিয়ে যান। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বলা যায় যে সংস্কারগুলি মোদী সরকার ইতিমধ্যেই নিয়েছে তার প্রভাবে করোনা পরবর্তী দশকে (যখন থেকে পূর্ণ মাত্রায় তার গণনা শুরু হবে) ভারতের গড় জিডিপি বৃদ্ধি ৮ শতাংশের আশপাশে থাকবে। তাই নিশ্চিত করে বলা যায় ২০২৪ সালে যে জোটই কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসুক না কেন তারা একটি সঠিক দিশায় দ্রুত ধাবমান বলিষ্ঠ অর্থনীতির উত্তরাধিকার পাবে। অবশ্য যদি না তারা গৃহীত সংস্কারগুলি বাতিল করে দেয়। উল্টোদিকে যদি তারা সংস্কারের গতি আরও বাড়ায় তাহলে আরও ভালো। পরিতাপের বিষয় এটাই, যারা বীজ বপন করে যায় অনেক সময়ই সোনালি ফসল তাদের ঘরে হয়তো ওঠে না।

(লেখক একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ)



বাংলাদেশে হিন্দুদের সামনে নতুন বিপদ, দেশত্যাগের নির্দেশ

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশে হিন্দুদের সামনে এক নতুন বিপদ তাদের অস্তিত্ব আরও বিপন্ন করে তুলেছে, করোনার মধ্যেও দেশত্যাগের আশঙ্কা বাড়ছে। সামাজিক গণমাধ্যমে হিন্দুদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার কিংবা তাদের ফেসবুক আইডি হ্যাক করে ইসলামবিরোধী পোস্ট দিয়ে ইসলাম অবমাননার অভিযোগ তুলে হামলা ও নির্যাতন চালানো হচ্ছে। হিন্দুদের বাড়িঘরে লুটপাট চালানোর পর অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে, মহিলাদের ওপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে। দেশজুড়ে ছড়ানো হচ্ছে হিন্দুবিদ্বেষ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফ্রান্সের সাম্প্রতিক ঘটনা। ইসলামের নবির কার্টুনের ঘটনায়ও হিন্দুদের জড়ানো হচ্ছে। অবিলম্বে তাদের দেশত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

সম্প্রতি এক অবিনব অভিযোগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে ২ লাখ হিন্দু বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশ সরকার তাদের নাগরিকত্ব দিয়েছে। ভারতীয় হাই কমিশনের তত্ত্বাবধানে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর পরিকল্পনায় এরা সরকার, প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনীর নানা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান নিয়েছে। 'দেশপ্রেমিক' লোকজনকে হয় ওএসডি করা হয়েছে, নয়তো বা তারা চাকুরিতে ঢুকতে পারছে না। অপপ্রচারকারীদের কেউ কেউ অন্যান্য স্পর্শকাতর বিষয়েও বল্গাহীন মিথ্যাচার করে চলেছে। লক্ষণীয়, সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দু ভারত ও কখনো কখনো বর্তমান সরকারকে একাকার করে সাম্প্রদায়িক প্রচার, প্ররোচনা চালানো হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে নীচের স্তর পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে আরও গভীর করা হচ্ছে ঠিক পাকিস্তানি আমলের মতোই। অথচ সরকার এক্ষেত্রে রহস্যজনক নীরবতা পালন করে চলেছে।

সর্বশেষ হামলার ঘটনা ঘটেছে কুমিল্লার মুরাদপুরে। ফ্রান্সে ইসলামের নবির কার্টুন প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে জবাই করে



হত্যার পর এই ঘটনার নিন্দা করে মুরাদপুরে কোরবানপুর গ্রামে হিন্দুপাড়ায় স্থানীয় স্কুল শিক্ষক শংকর দেবনাথের ফেসবুকে গত ১ নভেম্বর তাঁর প্যারিস নিবাসী এক আত্মীয় পোস্ট পাঠায়। এটা আরও কয়েকজনের ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় মুসলমনদের এ নিয়ে উত্তেজিত করা হয় মসজিদ থেকে। এগিয়ে আসেন ইসলামি দলগুলোর স্থানীয় নেতারা। হাজার হাজার লোক জড়ো হয়ে হিন্দুপাড়ায় হামলা চালায়, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বনকুমার শিব ও শংকর দেবনাথের বাড়ি-সহ অন্তত ১০টি বাড়িতে লুটপাটের পর অগ্নিসংযোগ করে। অন্যান্য বাড়িতেও লুটপাট চালানো হয়। কালী মন্দির ও মনসা মন্দিরেও প্রতিমা ভাঙচুরের পর অগ্নিসংযোগ করা হয়। এভাবেই ইতিপূর্বে ফেসবুক হ্যাক করে বা ভুয়া স্ক্রিনশট তৈরি করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইসলাম অবমাননার গুজব রটিয়ে কক্সবাজার-রামু-উখিয়া টেকনাফ থেকে পাবনার সাঁথিয়া, দিনাজপুরের চিরিরবন্দর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর, রংপুরের গঙ্গাচড়া, ভোলার বোরহানউদ্দিন ধ্বংসলীলা চালানো হয়। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ অভিযোগ করেছে, এই ঘটনাগুলোর বিচার হয়নি, হামলাকারীরা চেনা হলেও তাদের আইনের আওতায় আনা হয়নি। ফলে এসব এলাকার অনেক হিন্দু পরিবারের এখন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইসলাম অবমাননার ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে গত ২৬ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবরের মধ্যে দেশের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে ছয়জন ছাত্রকে সাময়িক বহিষ্কার করে তাদের কাছে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কুশল বরণ চক্রবর্তীকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধেও ইসলাম অবমাননার অভিযোগ করা হয়েছে। যে ছয়জন ছাত্রকে ধর্ম অবমাননার কথিতদায়ে ছাত্রত্ব সাময়িক বহিষ্কার করে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে তারা হলেন— নোয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের প্রান্তিক মজুমদার ও দীপ্ত পাল, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ ফাইন্যান্স ও ব্যাঙ্কিং বিভাগের ছাত্র মিথুন মণ্ডল, ঢাকা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী তিথি সরকার, পার্বতীপুর আদর্শ ডিগ্রি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী দীপ্তি রানি রবিদাশ, ফেনীর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মিথুন দে। এদের মধ্যে মিথুন মণ্ডলকে সাতক্ষীরার দেবহাটার গ্রামের বাড়ি, দীপ্তি রবিদাশকে তার পার্বতীপুরের গ্রামের বাড়ি, মিথুন দে-কে ফেনী থেকে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

অন্যদিকে তিথি সরকার গত ২৮ অক্টোবর থেকে নিখোঁজ। তিথির পরিবারের আশঙ্কা, তাকে গুম করা হয়েছে। ইতিপূর্বে ফেসবুকে রাকেশ চক্রবর্তী ও রণি সত্যার্থীর নাম ব্যবহার করে তাদের ফাঁসানো হয়। দুজনেই বর্তমানে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে আটক হয়ে কারাগারে আছেন।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা গত ৩ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, 'আমরা ভেবেছিলাম, অতিমারী করোনা ভাইরাস সমাজকে অনেক বেশি মানবিক করবে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, বিগত ৮ মার্চ প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হওয়ার পর থেকে সমাজে মানবিকতা অনেক বেশি নিম্নগামী হচ্ছে। একদিকে নারী, আরেকদিকে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। করোনা ভাইরাস সৃষ্ট দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতেও ধর্মীয়- জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস পূর্বেকার মতো অব্যাহত রয়েছে। এসব সন্ত্রাসের কোনো কোনোটির সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসীরা সরকারি দল আওয়ামি লিগ ও বিএনপির নেতা-কর্মীর পরিচয় দিয়েছে। আসলে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বাংলাদেশে নিত্যদিনের স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হলো— ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের ভয়ে ভীত করে উচ্ছেদের মাধ্যমে তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করা, যাতে দেশটি সংখ্যালঘুশূন্যে পরিণত হয়। পাকিস্তানি আমলের সাম্প্রদায়িক মহলবিশেষের এ ঘৃণ্য চক্রান্ত স্বাধীন বাংলাদেশেও অব্যাহত রয়েছে। এ চেষ্টা ফলপ্রসূ হলে দেশ ও জাতি গভীর সংকটে নিপতিত হবার আশংকা রয়েছে।'

নেতৃবৃন্দ বলেন, '২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত নির্বাচনে ক্ষমতায় আসার পর দেশজুড়ে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয়েছিল। পরে আওয়ামি লিগ আমলে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে ওই হামলা তদন্তে শাহাবউদ্দিন কমিশন গঠিত হয়েছিল। ২০০১-২০০৬ সালে রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের শনাক্ত করে এই কমিশন তাদের সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্ট পেশ করেছিল ২০১১ সালের শেষের দিকে। আজ ৯ বছর শেষ হতে চলেছে। এর সুপারিশ বাস্তবায়ন দূরে থাকুক, রিপোর্ট এখনো আলোর মুখ দেখল না — এটি একটি রহস্যজনক ব্যাপার। আওয়ামি লিগ নেতারা সর্বক্ষণ বিএনপি- জামায়েতের সমালোচনা করলেও তাদের আসলে সাম্প্রদায়িক হামলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে দ্বিধান্বিত কেন তা নানা প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের বিশেষ করে হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করার অভিপ্রায়ে এক সুগভীর চক্রান্তের অংশ হিসেবে সাইবার ডিজিটাল আইনের আওতায় একটি অ্যাপস ব্যবহারের কথাও জানা গেছে, যা চক্রান্তকারীদের আইডি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই অ্যাপস থেকে সুস্পষ্ট যে, ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের ছবি দিয়ে ধর্মীয় বিদ্বেষপূর্ণ নানা উস্কানিমূলক উক্তি সম্বলিত গুজব ছড়িয়ে সারা দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অপপ্রয়াসে সাম্প্রদায়িক মহল তথ্য প্রযুক্তি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে চলেছে। আজকের এ সংবাদ সম্মেলন থেকে এহেন জঘন্য অপরাধমূলক পোস্ট যে বা যারা করেছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ জাতীয় স্বার্থে গ্রহণ করতে আমরা সরকারের কাছে জোর দাবি জানাই।'

আওয়ামি লিগ নেতারা সর্বক্ষণ বিএনপি-জামায়েতের সমালোচনা করছে। অথচ সাম্প্রদায়িক হামলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে তারা এত দ্বিধান্বিত কেন— স্বাভাবিক ভাবেই জন্ম দিচ্ছে নানা প্রশ্নের।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কুশল বরণ চক্রবর্তীকে কানাডা থেকে হত্যার হুমকি দিয়ে বাংলাদেশের ইসলামি সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি বার্তা পাঠানো হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, 'তোরা চাচ্ছিস বাংলাদেশকে রামরাজ্য বানাতে। তোদের ''মোদী' বল আর 'যোগী' বল আমরা পরোয়া করি না। এই বাংলাদেশ হবে পাকিস্তান, ইসলমি রাষ্ট্র। কেউ আটকাতে পারবে না। তোদের শেষ আয়ু হলো ২০২৫ সাল, বড়ো জোর ২০২৬ সাল। এর পরে এই বাংলাদেশের মাটিতে একটা হিন্দু পাবি না, মূর্তি পূজারি পাবি না। আমরা শুধু আমাদের আমিরের নির্দেশের অপেক্ষা করছি।"

ধর্ম অবমাননার জিগির তুলে দিনাজপুরের পার্বতীপুর ও কুমিল্লার মুরাদনগরের সংখ্যালঘু এলাকায় আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন, ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্রত্ব বাতিলের অপপ্রয়াস, অধ্যাপক কুশল চক্রবর্তীকে হত্যার হুমকি, গ্রেপ্তারকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের আশু মুক্তি, কারণ দর্শাও নোটিশ প্রত্যাহার, সংখ্যালঘু সুরক্ষায় আইন প্রণয়ন, জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন ও সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠনের দাবিতে গত ৭ নভেম্বর ঐক্য পরিষদের আহ্বানে সারাদেশে জেলা, উপজেলা, মহানগর ও বিভাগীয় সদরে গণ অবস্থান ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকায় এ কর্মসূচি পালিত হয় শাহবাগ চত্বরে আর চট্টগ্রামে নিউমার্কেট চত্বরে। রাজধানীর বাইরে সব জেলা উপজেলায় এই কর্মসূচি পালিত হয়েছে। ◻

ঐতিহাসিক গৌরবোজ্জ্বল ৬ ডিসেম্বর

ডাঃ শম্ভুনাথ ধাড়া

একদা বাঙ্গলায় কৃত্তিবাস ওঝা বাংলায় রামায়ণ লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন, সেই কৃত্তিবাস ওঝার উত্তরপুরুষ বাঙ্গলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ হিন্দুত্বের জন্য লড়াই করে প্রাণ বলিদান দিয়েছেন, লড়াই করে বাঙ্গালির জন্য একটি রাজ্য আদায় করেছেন — সেই বাঙ্গলায় জয় শ্রীরাম ধ্বনি শুনলে কারও হৃদয় ভয়ে কেঁপে ওঠে। অথচ ১৯৯০ সালে রামজন্মভূমি মুক্তি আন্দোলনে এই পশ্চিমবঙ্গেরই দুইভাই ২০ বছরের শরদ ও ২২ বছরের রাম কোঠারী অযোধ্যায় বীরগতি প্রাপ্ত হয়েছেন।

১৯৯২ সালে বাঙ্গলার দুই প্রান্ত প্রমুখ মলয় রায় (আসানসোল বিভাগ কার্যবাহ) ও আমি স্বচক্ষে দেখেছি শ্রীরাম ধ্বনির শক্তি। কলকাতার নারায়ণ সোনীও দেখেছেন ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালের গৌরবময় দিনটি। আমি ও মলদয়দা ২৪ নভেম্বর অযোধ্যায় পৌঁছই। সমস্ত প্রদেশ-প্রমুখদের গোলাঘাটে কিশোরী শরণজীর ধর্মশালা ও তৎসংলগ্ন আরও একটি ধর্মশালায় থাকার ব্যবস্থা ছিল। প্রতিদিনই রাত আটটায় প্রদেশ প্রমুখদের বৈঠক হতো। সারা অযোধ্যা যেন করসেবকদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রস্তুত। ১৯৯০ সালে আমরা উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মূলায়ম সিংহ যাদব সরকারের পুলিশের নৃশংস অত্যাচার ও নারকীয় কার্যাবলী দেখেছি। কিন্তু ১৯৯২ সালে করসেবক ঘাতক মুলায়ম সিংহ ছিলেন না, ছিলেন রামভক্ত মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংহ। তাই ২.৭৭ একর সংলগ্ন বিরাট পরিসর রামজন্মভূমির দখলে। জিটি রোড থেকে বড়ো চওড়া রাস্তা রামজন্মভূমি পর্যন্ত তৈরি হয়েছে। হনুমানগড়ি সরু গলির রাস্তা দিয়ে আর যেতে হবে না করসেবকদের। এই হনুমান গড়িতেই ২ অক্টোবর ১৯৯০ সালে আন্দোলনকারীদের উপর কাঁদনে গ্যাস, লাঠিচার্জ এবং গুলি চালিয়েছিল মুলায়ম সরকার। ২ ডিসেম্বর ১৯৯২ সাল আমি বাঙ্গলার করসেবকদের আনার জন্য অযোধ্যা স্টেশনে গিয়েছিলাম। সেদিন রাম, শরদের বাবা হীরালাল কোঠারী ও বউদি অযোধ্যা স্টেশনে আমার সঙ্গে ছিলেন।

> **ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অসীম কৃপায় সেদিন লক্ষ লক্ষ করসেবক অযোধ্যায় পৌঁছেছিল। রামের নামে যেকোনো কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা সেদিন করসেবকদের ভেতর দেখা গিয়েছিল।**



চারিদিকে 'জয় শ্রীরাম' ও 'মন্দির ওহি বানায়েঙ্গে' ধ্বনিতে স্টেশন মুখরিত। তারই মাঝে করসেবকেরা যখন শুনলেন রাম-শরদের বাবা-মা স্টেশনে রয়েছেন। তখন সবাই তাঁদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছেন। আবেগে হীরালালজী ও বউদির চোখে জল এসেছিল। তাঁদের কান্না দেখে আমার চোখেও বন্যা নেমে এলো। তখনও আমরা ৬ ডিসেম্বরে কী হবে জানি না। বসতি প্রমুখ অযোধ্যার বিভাগ প্রচারক শম্ভুনাথ সিংহের উপর দায়িত্ব ছিল। ২ ডিসেম্বর সমস্ত তাঁবু ভরে গিয়েছিল। বৈঠকে সরকার্যবাহ শেষাদ্রিজী কড়া নির্দেশ দিলেন করসেবকদের আর আসতে হবে না। থাকার ব্যবস্থা করা যাবে না। বৈঠকে ঠিক হলো ৬ ডিসেম্বর সকালে সরযূ নদীতে স্নান করে ওখান থেকে মুঠিভরা বালি নিয়ে জন্মভূমিতে রেখে প্রতীকী করসেবা করা হবে। সমস্ত পরিকল্পনার জন্য সংস্কৃতি কলেজে ভোর চারটায় বৈঠক ডাকা হলো। দেখলাম, চারিদিকে করসেবকরা ওই তীব্র ঠাণ্ডার ভেতর খোলা আকাশের নীচে শুয়ে আছে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অসীম কৃপায় সেদিন লক্ষ লক্ষ করসেবক অযোধ্যায় পৌঁছেছিল। রামের নামে যেকোনো কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা সেদিন করসেবকদের ভেতর দেখা গিয়েছিল। আমরা খবরও পেয়েছিলাম মুলায়ম সিংহ সরকার সমস্ত শক্তি দিয়ে করসেবা বন্ধ করবে।

৬ ডিসেম্বর সকাল থেকেই করসেবকদের মনে একটা অজানা আশঙ্কা উঁকি দিচ্ছিল। তাসত্ত্বেও করসেবকরা উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুর ছিল। শেষাদ্রীজী বৈঠকে জানতে চেয়েছিলেন— করসেবকদের কী মনোভাব। অনেকেই সেদিন বুক ফুলিয়ে বলেছিল— 'এবার কিছু একটা করেই যাব, বার বার আসবো না।' ৬ ডিসেম্বর কী যেন একটা ঐশ্বরিক শক্তি সবার ওপর ভর করেছিল। রাষ্ট্রভক্তি যেন রামভক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে পাঁচশো বছরের কলঙ্ক মোচনের জন্য উদ্‌গ্রীব। ভোর হতেই দলে দলে করসেবক সরযূর পবিত্র জলে স্নান করে একমুঠো বালি নিয়ে রামজন্মভূমির দিকে জয় শ্রীরাম বলতে বলতে চলেছে। সারা অযোধ্যার আকাশে বাতাসে একটাই শব্দ 'জয় শ্রীরাম মন্দির ওহি বানায়েঙ্গে'। ঠিক ৯টা থেকে আমরা পশ্চিমবঙ্গের করসেবকরা বিহারের করসেবকদের পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়েছি। রামধুন গাইতে গাইতে তালে তালে অনেক যুবক তখন নাচতে শুরু করেছে। মূল মঞ্চ থেকে তখন অশোক সিংঘলের ভাষণ চলছে। পরপর ভাষণ দিলেন মুরলীমোহন যোশী, শেষাদ্রিজী, সাধ্বী ঋতম্ভরা, উমা ভারতী প্রমুখ। আদবানীজী কেমন করে করসেবকরা লাইনে দাঁড়িয়ে করসেবা করবেন তা বুঝিয়ে বলছিলেন। প্রদেশ প্রমুখরা তাদের প্রদেশের করসেবকদের লাইনে দাঁড় করিয়েছে। সবার আগে ছিল অন্ধ্রপ্রদেশ, তারপর তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি পর পর। তখন সকাল ১০টা ৩০ মিনিট। এমন সময় দেখা গেল করসেবকরা লাইন ভেঙে মন্দিরের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে বেশ কয়েকজন গম্বুজের উপরে উঠে গেরুয়া পতাকা লাগিয়ে দিয়েছে। এদিকে মঞ্চ থেকে মাইকে অশোক সিংঘল, আদবানীরা তা করতে বারণ করছেন। গম্বুজ থেকে সবাইকে নেমে আসতে বলছেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে! তখন যেন করসেবকেরা উন্মাদ হয়ে গেছে। জয় শ্রীরাম ধ্বনি আকাশ বাতাস মুখরিত করে চলেছে। প্রথমদিকে আমরা যারা ছিলাম তারা সবাই অনুরোধ করছিলাম গম্বুজ থেকে নেমে আসার জন্য। তখন কোনো নেতার আদেশ গৌণ হয়ে গেছে। বাঁধন ছাড়া হয়ে সবাই গম্বুজে উঠতে চায়। শেষাদ্রিজী ১২টা ভাষায় বারণ করলেন, কিন্তু কেউ কর্ণপাত করল না। দুপুর ১২টা। গম্বুজের উপর থেকে ভিড়ে চোটে নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলিতে ঝুপঝাপ করে করসেবকেরা পড়ে যাচ্ছে। কারও হাত, পা ভেঙে যাচ্ছে। অনেক কষ্ট করে সবাইকে নীচে নামানো হলো। তারপরই করসেবকেরা ছুটে গিয়ে লক্ষ্মণ মন্দির তৈরির গোডাউন থেকে কোদাল, শাবল, গাঁইতি, রশি ইত্যাদি নিয়ে নীচ থেকে ইট সরানো শুরু শুরু করল। তখন আর কোনো নিয়ন্ত্রণ রইল না। উৎসাহ দেবার জন্য উমা ভারতী মূল মঞ্চ থেকে বলতে শুরু করল— 'আউর এক ধাক্কা মার দো'— করসেবকেরা বলতে আরম্ভ করল— 'বাবর কা হাড্ডি তোড় দো'। পাঁচশো বছরে আগে বাবরের সেনাপতি মির বাকি হিন্দু সাধু-সন্ত আর রামভক্তের রক্তের হোলি খেলেছিল, কত রামভক্তকে সেদিন তারা তরবারি দিয়ে কেটে ফেলেছিল , তার ইতিহাস আজ আমাদের কাছে নেই। তার প্রতিশোধ নিচ্ছে আজ ৬ ডিসেম্বর ৯২ সালে। তবে পিশাচ মোগলদের মতো রক্তের হোলি খেলে নয়, রক্তশূন্য আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের আরাধ্যা দেবতা রামচন্দ্রের জন্মভূমির উদ্ধার। তাই আক্রমণকারী বিদেশির 'হাড্ডি তোড় দো' মানে বাবর যে ধাঁচা তৈরি করেছিল জন্মভূমির ওপর সেইটাই ভেঙে দিতে বলছে। প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনায় চলছে কলঙ্ক মোচনের কাজ। কয়েক লক্ষ রামভক্ত হাত লাগিয়েছে।

ঠিক ১-৪৫ নিনিটে মন্দিরের ডান দিকের গম্বুজ হুড়মুড় করে পড়ে গেল। বেড়ে গেল নৃত্যরত রামভক্তদের জয় শ্রীরাম ধ্বনি। হাততালি, উল্লাস সব মিলিয়ে একাকার। এ দৃশ্য যে দেখেছে তার জীবন ধন্য হয়েছে। অন্তত আমি মনে করি । জীবন ধন্য এরকম একটা অভিজ্ঞতায়। মনে হচ্ছিল পুরো ভারতবর্ষ যেন অযোধ্যায় এসে ভারতদর্শন আর রামদর্শন একসঙ্গে করছে।

ঠিক দুপুর ১-৩৫ মিনিটে বাঁদিকের গম্বুজটি পড়ে গেল। আবার বেড়ে গেল করতালি দিয়ে জয় শ্রীরাম ধ্বনি। ঠিক ৪টায় মাঝখানের বড়ো গম্বুজটা পড়ে গেল এবং চারিদিকে ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর সাধুসন্ত, রামভক্তদের আনন্দে ধুলোয় গড়াগড়ি। যত রামভক্ত ছিল ওই রামলালার জন্মস্থানে গড়াগড়ি করে নিজেকে ধন্য মনে করছে। রামজন্মভূমির ইট একটি করে যে যার মতো বাড়ি নিয়ে গেছে। ইতিহাস রচনা করল রামভক্ত করসেবকেরা। তাতে পশ্চিমবঙ্গের করসেবকরাও ছিলেন। কে বলে রামভক্ত পশ্চিমবঙ্গে নেই। পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার করসেবকেও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ৬ ডিসেম্বর দিনটি প্রকৃত অর্থেই শৌর্য দিবস। প্রগতিশীলদের কাছে আতঙ্কের। তাই অনেকেই কান বন্ধ করে চলেন জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে। কারও কারও মনে ভয় ঢুকে গিয়ে তাড়া করে বেড়ায়। তারা মনে করে এই বুঝি আমাদের ধ্বংস করে দেবে।

গত ৫ আগস্ট সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী রামমন্দিরের ভিত্তিপূজা করলেন। প্রতিটি রামভক্ত তথা করসেবকদের মনে আনন্দ আর গৌরবে প্রকৃত স্বাধীনতার অনুভূতি হলো। যেসব করসেবক স্বর্গত হয়েছেন যেমন রাঙাদা, সুকুমারদা (পাত্র) যতীন সমাদ্দার, মলয়দা (রায়) তাঁরাও স্বর্গ থেকে দেখতে পাচ্ছেন রামমন্দিরের নির্মাণ কাজ। সূচনা হবে সত্যযুগের, ঘোর কলির বিদায় আসন্ন, ভারতে প্রতিষ্ঠিত হবে রামরাজ্য। □

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ

ধর্মপুরুষার্থ ও শিক্ষা

ইন্দুমতী কাটদরে

অর্থপুরুষার্থ

মানুষের প্রকৃতিগত জীবনের কেন্দ্র হলো কামপুরুষার্থ। কামপুরুষার্থের সংযোগী হলো অর্থপুরুষার্থ। ইচ্ছাগুলির পূর্তির জন্য মানুষের অসংখ্য পদার্থের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলো পদার্থ তাদের বিনা পরিশ্রমেই প্রাপ্ত হয়। এদের মধ্যে বাতাস, সূর্যালোক, ফুলের সুগন্ধ, পাখির কলকাকলির সংগীত বিনা প্রচেষ্টাতেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অনেক পদার্থ এমন আছে যা অনেক প্রয়াস করে প্রাপ্ত করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, বনজঙ্গলে আপনা থেকেই উৎপন্ন হওয়া বৃক্ষাদির ফল, মূল অথবা ধান বিনা প্রয়াসেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আবশ্যকতানুসারে ফল শাকসবজি এবং ধান পাবার জন্য তাকে কৃষিকাজ করবার প্রয়োজন হয়। বস্ত্র প্রাপ্ত করবার জন্য তাকে প্রয়াস করতে হয়। এই প্রয়াসগুলোকেই অর্থপুরুষার্থ বলা হয়ে থাকে।

অর্থ কামনানুসারী হয়ে থাকে। যে যে পদার্থের ইচ্ছা মানুষের হয়ে থাকে সেই সেই পদার্থকে প্রাপ্ত করবার জন্য মানুষ চেষ্টা করে থাকে। এই প্রচেষ্টার পরিণামস্বরূপ অনেক প্রকারের শিল্প স্থাপিত হয়েছে। অন্নের আবশ্যকতা পূরণের জন্য কৃষিশিল্প, বস্ত্রের আবশ্যকতা পূরণের জন্য বস্ত্র উদ্যোগ, আবাসের আবশ্যকতা পূরণের জন্য গৃহ নির্মাণ শিল্প বিকশিত হয়ে থাকে। কৃষির জন্য আবশ্যক উপকরণ নির্মাণ হেতুও অনেক প্রকারের শিল্প স্থাপন করা হয়ে থাকে। এসব শিল্পের একটা বড়ো জাল তৈরি হয়, কেননা সমস্ত শিল্পই একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে থাকে। চিন্তাভাবনা করলে উপলব্ধি করা যায় যে, কৃষিই হচ্ছে মূল শিল্প। অবশিষ্ট সব শিল্প হয় কৃষির সহায়ক অথবা কৃষিনির্ভর। উদাহরণস্বরূপ, বস্ত্র উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, কিন্তু এর কাঁচামাল কৃষি থেকেই প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এজন্য ওটা কৃষির ওপর নির্ভর করে। গোরুর গাড়ি, লাঙ্গল, কোদাল ইত্যাদি তৈরির শিল্প হচ্ছে কৃষির সহায়ক উদ্যোগ। উদ্যোগগুলোর এই শৃঙ্খল অত্যন্ত জটিল। একে বোঝা এবং সুশৃঙ্খলভাবে চালানো অর্থপুরুষার্থের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কামপুরুষার্থ হলো প্রাকৃতিক। অর্থপুরুষার্থ মানুষের নির্মিত ব্যবস্থা। এজন্যই এর অনেক ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থাকে চালাবার জন্য অনেক নিয়ম আছে। এ থেকেই গুরুত্বপূর্ণ অর্থশাস্ত্র নির্মিত হয়েছে।

অর্থপুরুষার্থের বিষয়গুলো এরকম :

(১) **সমৃদ্ধি লাভ করবার জন্য তৎপরতা :** মানুষের দরিদ্র থাকা উচিত নয়। তার সমৃদ্ধির ইচ্ছা থাকা দরকার। জীবনের জন্য আবশ্যক শরীর মন ইত্যাদিকে সুখ দেবার। চিত্তকে প্রসন্নকারী অনেক পদার্থের সেবন করবার জন্য অর্থ চাই। সেটা প্রভুত মাত্রায় কীভাবে পাওয়া যাবে তার চিন্তা করা দরকার। নিজের ভাণ্ডার ধনধান্যে পূর্ণ হোক, উত্তম প্রকারের বস্ত্রালংকার প্রাপ্ত হোক, কোথাও কারও যেন কোনো কিছুর অভাব না থাকে, এমন আয়োজন মানুষের করা দরকার। সমৃদ্ধি কী করে প্রাপ্ত করা যায় তার জ্ঞান থাকা দরকার।

সমৃদ্ধি প্রাপ্ত করবার জন্য উদ্যমশীল হওয়া : সমৃদ্ধি প্রাপ্ত করবার ইচ্ছা মাত্রই তা প্রাপ্ত হয় না। 'উদ্যমেন হি সিদ্ধ্যন্তি কার্যাণি ন মনোরথৈঃ', অর্থাৎ মানুষের সেরকম ইচ্ছাও না থাকা উচিত। নিজের পরিশ্রম দ্বারাই তা প্রাপ্ত হোক এমন দৃষ্টিতে তার কাজ করা দরকার। অনেক প্রকারের কাজ শেখা উচিত, নিরন্তর কাজ করা দরকার। কাজ বিনে সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ই না, এটা জানা চাই। কাজ না করে যে সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে দেখা যায় তা হলো দেখনদারি সমৃদ্ধি, তা কার্যকরী নয় এবং পারিপার্শ্বিক মানুষকে এই ভাব বিনাশ করে থাকে।

শিল্পের প্রতিষ্ঠা : কাজ করার পরিণামস্বরূপ সমৃদ্ধি প্রাপ্তির জন্য কাজ করাটার প্রতিষ্ঠার বিষয় মান্য করাও আবশ্যক। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে তো একথা অত্যন্ত আবশ্যক। কেননা আজ কাজ সম্পাদনকারীকে হেয় এবং কাজে বিনিয়োগকারীকে প্রতিষ্ঠিত মানা হয়। এমনটা করলে সমৃদ্ধির দেখনদারিত্ব নির্মিত হয় এবং প্রকৃত সমৃদ্ধির বিনাশ হয়ে থাকে। কাজ করার কুশলতা অর্জন করা বিশেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত। যখন কুশলতা প্রাপ্ত হয় তখন কাজের গতি বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধি সক্রিয় হয়, কল্পনা শক্তি জাগ্রত হয় এবং নব নব আবিষ্কার সম্ভব হয়ে থাকে। এতে করে কাজ শিল্পের মর্যাদা পায় এবং করতে গিয়ে আনন্দের অনুভূতি হয়। শ্রম ও কাজে আনন্দের অনুভূতি সত্যিই সুখকারী হয়ে থাকে।

সবার জন্য সমৃদ্ধি : সমৃদ্ধির কামনা একার জন্য করা উচিত নয়। সমৃদ্ধি

থেকে প্রাপ্ত হয় সুখ। সেই সুখকে ভোগ করবার জন্য উপযুক্ত স্বাস্থ্য থাকা চাই। তার পরিণামস্বরূপ সুখকে প্রসাদরূপে গ্রহণ করার বৃত্তি থেকে প্রাপ্ত কল্যাণ সবার জন্য হওয়া চাই— এমন কামনা করা দরকার। এমন কামনা করলে সমৃদ্ধি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বজায় থাকে। অন্যথায় তা শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায়। এমন কামনাকে ভারতীয় মানসের শাশ্বত স্বরূপের অর্থে এই শ্লোকটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।

সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ।।

অহং ও উত্তেজনা থেকে মুক্তি : পরিশ্রমপূর্বক কাজ করলে শারিরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভ করা যায়। এর পরিণামস্বরূপ ব্যক্তিগত ও সামাগ্রিক জীবনে লোভ ও মোহজনিত যে অহং উৎপন্ন হয়ে থাকে তা কম হয়ে থাকে। অর্থদ্বারা প্রাপ্ত সমৃদ্ধি ভোগ করার আনন্দ পাওয়া যায়। সংঘর্ষ ও হিংসা কম হয়ে থাকে।

সংযমিত উপভোগ : পরিশ্রমের সঙ্গে উৎপাদন জুড়লে উপভোগ স্বাভাবিক রূপেই সংযমিত থাকে। কেননা উপভোগের জন্য সময়ও কম থাকে এবং পরিশ্রমপূর্বক কৃত কাজে আনন্দও পর্যাপ্ত পাওয়া যায়। সেই আনন্দ সৃজনাত্মক হওয়ার কারণে তার গুণমানও অধিক ভালো হয়ে থাকে। শরীর মন বুদ্ধি ইত্যাদি যে উদ্দেশ্যে তৈরি সেই উদ্দেশ্যে পূর্তির কারণে সেই আনন্দ হয় স্বাভাবিক, কৃত্রিম নয়।

সামাজিকতা : অর্থ প্রাপ্তির জন্য পরিশ্রম করতে এবং উৎপাদন হেতু পরিশ্রম করায় আরও দুটি বিষয় নিজে নিজেই ঘটে থাকে। একটি হলো উৎপাদন উপযোগী বস্তুরই হয়ে থাকে। এবং অন্যটি কেবল নিজের জন্য না হয়ে পরের জন্য হয়ে থাকে। এই কারণে এর দ্বারা সামাজিকতার বিকাশ হতে খুব



সহায়ক হয়ে থাকে। সামাজিকতায় নিজের একটা সার্থক আনন্দ হয়ে থাকে যার মাঝে সুরক্ষা এবং নিশ্চয়তা নিজে নিজেই সমাবিষ্ট হয়ে যায়।

অর্থপুরুষার্থ হেতু করণীয় : অর্থপুরুষার্থের সিদ্ধির জন্য কিছু বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়। এগুলো হলো :

(১) অর্থ ব্যবহার সর্বদাই সমূহের মধ্যেই চলে থাকে। উপভোগের জন্য যে বস্তুই চাই না কেন তা কখনও এক ব্যক্তির দ্বারা উৎপাদিত হতে পারে না। কাপড় একজন তৈরি করে তো অন্ন আরেকজন উৎপাদন করে। বাড়ি তৃতীয় ব্যক্তি তৈরি করে তো চেয়ার খাট অন্য কেউ তৈরি করে। যখন সামগ্রিক কাজ হয় তখন সকলের কথা মাথায় রেখেই কাজ করা হয়ে থাকে। সবার কথা মাথায় রাখার তাৎপর্য কী? একটা তো এই যে, সবার জন্য আবশ্যক বস্তুর উৎপাদন পর্যাপ্তমাত্রায় হতে পারে এরকম উৎপাদন সুনিশ্চিত হওয়া দরকার। দ্বিতীয়ত উৎপাদনের সীমা থেকে মানুষ বেরিয়েই যাক, এরকম উৎপদনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত নয়। তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, উৎপাদন আবশ্যকতার চাইতে অধিক না হওয়া দরকার। পরিশ্রম নির্ভর উৎপাদন দ্বারা কেন্দ্রীকরণ হয় না।

(২) উৎপাদনের সঙ্গে ব্যবসা জুড়ে থাকে। ব্যবসার সঙ্গে অর্থার্জন জুড়ে থাকে। উৎপাদন সবার উপভোগ করার জন্য হয়ে থাকে, যখন অর্থার্জন ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে থাকে। দুটোরই সামঞ্জস্য হওয়া দরকার। উৎপাদন ও অর্থার্জন সবার জন্য সুলভ হওয়া দরকার। এই দৃষ্টিতেই আমাদের দেশে বর্ণ ও জাতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্ণ ও জাতির সম্বন্ধ আচরণ ও ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। ব্যবসা সবারই স্বধর্ম বলে মনে করা হতো। স্বধর্মকে কোনো অবস্থাতেই ছাড়া উচিত নয় । সামাজিক বাধ্যবাধকতাও ছিল। সমাজ ও ব্যক্তির আর্থিক সুরক্ষা এবং সবার জন্য উৎপাদন ও অর্থার্জনের সুলভতা এতে তৈরি হতো। আজ আমরা বর্ণ ব্যবস্থা ও জাতি ব্যবস্থা সর্বতোভাবে ত্যাগ করেছি শুধুই নয়, বরং তা বিকৃত করে দিয়েছি। আর বর্ণের প্রশ্নকে বিভ্রান্ত করেছি। তার চর্চা কোথাও অন্যত্র করা যাবে, কিন্তু এখন বর্তমান ব্যবস্থার (বা অব্যবস্থা) নিরিখেই কথা বলা দরকার।

(৩) উৎপাদনের সঙ্গে বণ্টনের ব্যবস্থাও জড়িয়ে আছে। এর অর্থ হচ্ছে আবশ্যক বস্তুসমূহের উৎপাদন হবার পর আবশ্যকতানুযায়ী সবার উৎপাদিত দ্রব্য পাওয়া দরকার। এই দৃষ্টিতে বিতরণের নিয়মও তৈরি হওয়া দরকার। উৎপাদন বিতরণ ও অর্থার্জনের ব্যবস্থাই হচ্ছে বাজার। এই বাজরের নিয়ন্ত্রণ আবশ্যকতার পূর্তির নিরিখেই হওয়া দরকার। আজ অর্থার্জনই লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে, আবশ্যকতার পূর্তি ও জীবনধারণ নয়। এটা খুব অমানবিক ব্যবস্থা, এর পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে।

(৪) উৎপাদনের সম্বন্ধে উৎপাদিত বস্তুর নিশ্চিত করা অত্যন্ত আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ, অন্ন ও বস্ত্রের উৎপাদনকে খেলনা উৎপাদনের ওপরে স্থান দেওয়া দরকার। অন্নের উৎপাদনের জন্য ব্যক্তির অধিক পরিশ্রম এবং কম অর্থার্জন হয়ে থাকে, অন্যদিকে খেলনা উৎপাদনের জন্য কম পরিশ্রম এবং বেশি উপার্জন হলেও খাদ্যান্ন উৎপাদনকে খেলনা উৎপাদনের চাইতে অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং অন্য উৎপাদনের বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত। (ক্রমশ)

(ভাষান্তর : সূর্যপ্রকাশ দাশগুপ্ত, প্রাক্তন অধ্যক্ষ)



রাষ্ট্রঋষি দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজীর তৃতীয় পন্থা এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে তার প্রাসঙ্গিকতা

ড. তরুণ মজুমদার

করোনা অতিমারীর প্রেক্ষিতে অনিবার্য কারণেই ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মৌলিক প্রাণশক্তির বাস্তবিক স্থানান্তর ঘটছে। শুধুমাত্র খাতায়-কলমে নয় প্রকৃত অর্থেই স্বাবলম্বী ও স্বদেশী কেন্দ্রিক হয়ে ওঠার পথে আমাদের দেশ। বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকে নৃতত্ত্ববিদ্যার পশ্চিমি সংস্করণ 'one size fits all model'-কে বলপূর্বক অর্থনীতির আঙিনায় ঢোকানো হয়েছিল যার প্রধান ও প্রাথমিক শর্তই ছিল সমস্ত দেশগুলির তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, দর্শন এবং অনন্যতা পরিহার করে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নে বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ। ২০০৫ সালে জি-টোয়েন্টি নেশনস্ এই নীতির অসারতাকে তুলে ধরে এবং এর সাসটেইনেবিলিটি নিয়ে প্রশ্ন তুলে প্রতিটি দেশের তাদের নিজস্বতা অনুযায়ী উপযুক্ত আর্থিক নীতি থাকা উচিত বলে ঘোষণা করে। অথচ আমাদের দুর্ভাগ্য, এই একই কথা নব্বইয়ের দশক থেকে রাষ্ট্রঋষি দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজী বারংবার বলে এসেছেন কিন্তু দেশের স্বঘোষিত পেশাদার বুদ্ধিজীবীরা যারা আধুনিকতা ও পশ্চিমিকরণকে হাস্যকরভাবে তাদের চিন্তাভাবনার দৈনতা দিয়ে একে অপরের পরিপূরক ভেবে থাকেন, তারা দত্তোপন্তজীর তত্ত্বকে চূড়ান্ত অবহেলা ও তাচ্ছিল্য করেছেন।

বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে আদর্শগত লড়াইয়ে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়ে এবং অর্থনীতিতে নতুন দিশা দেখাতে অপারগ এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা বিশ্বায়ন, পাশ্চাত্যকরণ এবং কিছু ক্ষেত্রে মার্কসীয় তত্ত্বকে সামনে রেখে নির্লজ্জ চাটুকারিতা করে গেছেন। অথচ বাস্তবিক অর্থেই আজ সারা বিশ্বে কমিউনিস্ট অর্থনীতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে বাতিলের খাতায়। চাপিয়ে দেওয়া পশ্চিমি ধাঁচের বিশ্বায়ন, ক্যাপিটালিস্ট অর্থনীতিও প্রায় শেষের পথে। ঠিক এখানেই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ভাবশিষ্য একাত্ম মানবদর্শনের একনিষ্ঠ ছাত্র রাষ্ট্রঋষি দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজীর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে Third way বা তৃতীয় পন্থার প্রাসঙ্গিকতা। Third way পুস্তকটির প্রকাশনার পর ভারতীয় তথা বিশ্বের ism-less বৌদ্ধিক জগতে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন দেখা দেয়। যেখানে মানসিক সত্তা বিসর্জিত আদ্যন্ত বস্তুবাদী পশ্চিমি অর্থনৈতিক দর্শনকে সন্দেহাতীতভাবে অসার প্রমাণিত করা হয়েছে। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনগুলি মানসিক পরিবর্তন ও সাংস্কৃতিক ভিত্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলেই তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে জনমানসে অনুসৃত হয়, নতুবা নয়। ভারতীয় সনাতনী ঐতিহ্যগত মূল্যবোধগুলি পশ্চিমি প্রকোষ্ঠ ভিত্তিক খণ্ডিত মূল্যবোধের থেকে যে অনেক উন্নত তা আমরা ক্রমশ উত্থিত জাতীয় চেতনার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হচ্ছি।

বস্তুগত উপাদান ও মানসিক উপাদান একই মুদ্রার দুই পিঠ। শুধুমাত্র কোনো একটির উপর অত্যধিক অসম গুরুত্ব আরোপ করলে সমাজ জীবনে ভারসাম্যতা নষ্ট হয়ে বৈশ্বিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। বর্তমান বিশ্বে সর্বত্র মানবজাতির নিদারুণ যন্ত্রণা এরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পাশ্চাত্য ধারণা অনুযায়ী জাতীয়তাবোধ ও আত্মনির্ভরতা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক চিন্তন। হ্যাঁ, শুধুমাত্র বস্তুকেন্দ্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় জাতীয়তাবাদ ঘৃণিত সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হতে পারে কিন্তু ভারতীয় একাত্ম মানব দর্শনের একীকরণের মানসিকতা এক সমৃদ্ধ বিশ্ব রাষ্ট্রের উত্থানের কথা ভাবে, যা প্রত্যেকটি জাতির সংস্কৃতি, চিরন্তন মানবতা এবং বস্তুবাদ-সহ সব কিছুতেই একসঙ্গে গ্রহণ করতে সমর্থ, যেখানে অবস্তুগত

মূল্যবোধ বস্তুবাদী মূল্যবোধের সঙ্গে সূক্ষ্ম ভাবে মিশে থাকে। নিজ ঋদ্ধ সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে অন্ধভাবে পশ্চিমি অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা বারংবার রেল বগির আগে ইঞ্জিন না জুড়ে, তার পেছনে ইঞ্জিন জুড়ে বৃথাই সভ্যতার চাকাকে ঠেলে চলেছি। এই মুহূর্তে আমাদের অবজেক্টিভ রেভোলিউশনকে বাদ দিয়ে সর্বাগ্রে সাবজেক্টিভ রেভোলিউশনের পথ বেছে নেওয়া উচিত।

করোনা পরিস্থিতি এবং বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান মৌলবাদী হিংসা ভারতবর্ষের সামনে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে; যার জন্য দরকার জাতীয় পুনরুত্থান। সর্বাগ্রে প্রয়োজন আধুনিকতার নামে অন্ধভাবে পশ্চিমি সভ্যতাকে অনুকরণ বন্ধ করা। আমাদের সুপ্রাচীন ঋদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতি নজর ঘোরালেই সত্য উপলব্ধি করা সম্ভব। যে সত্যের কোনো দল নেই, শ্রেণী নেই, কোনো বর্ণ নেই, কোনো সম্প্রদায় নেই, নেই কোনো জাতি; যা সত্যিই সর্বজনীন। কণাদের পারমণবিক তত্ত্ব, কপিল মুনির দ্বন্দ্ববাদ, পৃথিবীর সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করার আর্যভট্টের তত্ত্ব, বৃহস্পতির মেটেরিয়ালিজম্- এর উপর তত্ত্ব, পতঞ্জলি কর্তৃক বস্তুর সংজ্ঞা, বৈদিক মুনি-ঋষিদের দ্বারা সময়, স্থান ও আপেক্ষিকতা নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠিত ব্যাখ্যাগুলি আজও আধুনিকতার চরম নিদর্শন। এই বিষয়ে H.G. Chernyshevsky-এর পর্যবেক্ষণটি শিরোধার্য—'The principles explained & proved by the present day sciences were already found and taken to be true by the Greek philosophers and much earlier, by the Indian thinkers.' চিরন্তন সত্য যা অস্বীকার করার কোনো উপায়ই নেই, তা হলো হিন্দু বিজ্ঞান ও সভ্যতা আরব ও পারস্য হয়ে ইউরোপে পৌঁছেছিল এবং এর ফলেই ইউরোপ অন্ধকার দিনগুলি শেষ হয়ে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়।

বর্তমান সমস্যাসংকুল বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বিশ্বায়নের হিন্দু সংস্করণই একমাত্র পাথেয় হওয়া উচিত। 'এক সমৃদ্ধ বিশ্ব রাষ্ট্রই হলো একমাত্র মুক্তির উপায়। এটিই প্রকৃত বিশ্বায়ন। কারণ প্রায় একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে পশ্চিমি শিল্পায়ন ও অর্থনীতির নির্বোধ আক্ষরিক অনুকরণ আমাদের উপহার দিয়েছে— গ্রাম ছেড়ে শহরাঞ্চলে মানব প্লাবন, পরিযায়ী শ্রমিক, পরিবার প্রথা ভেঙে পড়া, গ্রামে চাষের জমি বহুবিভক্ত হওয়া, শহরাঞ্চলে অপর্যাপ্ত আবসন, বস্তি, পানীয় জলের অভাব, শিল্পে দুর্ঘটনা, নিরক্ষরতা, মানব জীবন থেকে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ হারিয়ে যাওয়া, লিঙ্গ অনুপাতে ভারসাম্যহীনতা, আন্তর্জাতিক মৌলবাদ, পৈশাচিক জিহাদ ও সন্ত্রাস, দূষণ ও চূড়ান্ত আর্থিক দুর্নীতি। চলতি বিশ্বায়ন এবং শিল্প-অর্থনীতি একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও আর্থিক কারচুপির প্রতিকার করতে, ক্রমাগত পরিবেশের শোষণ এবং ধ্বংস রুখতে, সমাজে সমতা আনতে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্বেষ বাদ দিয়ে সহযোগিতামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আনতে, ওয়েজ- এমপ্লয়মেন্টের পরিবর্তে সেল্ফ-এমপ্লয়মেন্টকে সার্থকতা দিতে ব্যর্থ পর্যবসিত হয়েছে।

দেশহিতের ভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সনাতনী ঐতিহ্যে আস্থাশীল সাধারণ মানুষেরা আন্তর্জাতিকতার বিরুদ্ধে নয়, বরং তারা চান জাতীয় স্বাবলম্বিতা, প্রতিটি জাতির আত্মসম্মান এবং ঐতিহ্য ও কৃষ্টি যেন বিশ্বমঞ্চে উপযুক্ত সম্মান পায়। প্রত্যেকটি দেশের অগ্রগতি ও বিকাশের মডেলটি সেই দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। চাপিয়ে দেওয়া সরলরৈখিক অর্থনীতি বহুমাত্রিক সমাজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসম্বন্ধ বিষয়। সুতরাং বহুধা প্রকোষ্ঠ বিভক্ত ও খণ্ডিত পশ্চিমি চিন্তন-চালিত চলতি বিশ্ব অর্থনৈতিক নীতির সামগ্রিক কুপ্রভাব থেকে সমাজকে মুক্ত করতে পারে কেবলমাত্র একাত্ম হিন্দু চিন্তন ভিত্তিক স্বদেশী নির্ভর অর্থনীতি। দত্তোপন্তজী বলেছেন, 'Swadeshi not merely an economic affairs confined to material goods but a broad bassed ideology embracing all departments of national life.' সবকা সাথ সবকা বিকাশের মতো মানবিক আবেদনকে সামনে রেখে ঠেংড়ীজীর থার্ডওয়ে বা তৃতীয় পন্থার আদর্শে নির্মিত স্বদেশী অর্থনীতির মাধ্যমে নতুন দিশার দিকে এগিয়ে যাওয়াটাই একমাত্র শাশ্বত পথ। □

সবকা সাথ সবকা বিকাশের মতো মানবিক আবেদনকে সামনে রেখে ঠেংড়ীজীর থার্ডওয়ে বা তৃতীয় পন্থার আদর্শে নির্মিত স্বদেশী অর্থনীতির মাধ্যমে নতুন দিশার দিকে এগিয়ে যাওয়াটাই একমাত্র শাশ্বত পথ।

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

বাংলা গণমাধ্যম ও বামমার্গী বুদ্ধিজীবীদের অশুভ আঁতাত

বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সংবাদপত্র-সহ সমস্ত রকমের গণমাধ্যম হলো গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইন, শাসন ও বিচার ব্যবস্থার খামতি ও দুর্বলতাগুলোকে তুলে ধরে তার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করা গণমাধ্যমের প্রধান কাজ। আইন, শাসন ও বিচার ব্যবস্থার কোনো একটি খুঁটি দুর্বল হয়ে পড়লে গণতান্ত্রিক ধাঁচা নড়বড়ে হবার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য তিনটি স্তরের পরিপূরক হিসাবে গণমাধ্যম চতুর্থ স্তম্ভের কাজ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমানে বিশেষত বাংলা গণমাধ্যম কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করে চলেছে। সমস্যাটা হলো বর্তমানে বরুণ সেনগুপ্তের মতো সংবাদপত্র সম্পাদকের অভাব। কোনো চাপ বা লোভের নিকট তাঁকে ঝুঁকতে দেখেনি বাঙ্গালি। জল্লাদ-স্বরূপ বামশাসনাধীন পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় বসে সরকারের ভুলত্রুটি সম্বন্ধে তিনি অকপটে তাঁর কাগজে লিখে গেছেন। আর এখন সেই দিন আর নেই। এখন শ্রীমতী ঘোষ বা কুমনবাবুদের সেই দম কোথায়। সামান্য সরকারি বিজ্ঞাপন ও কিছু দান দক্ষিণা পেতেই এরা সুড়সুড় করে আঁচলের তলায়। সরকারি বিজ্ঞাপন পাওয়ার লালসা ব্যবসায়িক সংবাদপত্র গোষ্ঠীর থাকাই স্বাভাবিক, তবে এতটা হ্যাংলামো ভাবা যায় না। রাজ্যের নির্বাচনে এদের গঠনমূলক বা তথ্যনির্ভর সংবাদ পরিবেশন যেখানে জনমত তৈরিতে বড়ো ভূমিকা নিতে পারত সেখানে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা এই সকল সংবাদপত্র গোষ্ঠী উল্টোটাই করে। যার জন্য লাগামহীন নির্বাচনী সন্ত্রাসের ট্রাডিশন সমানে চলে আসছে। সরকারি ঢাক পেটানোতে এদের অপরিসীম দক্ষতা। অবশ্য নিজেদের পত্রিকাতে কখনও কখনও ভিন্ন মতাবলম্বী কলামনিস্টদের নিবন্ধ ছেপে পাঠকদের নিকট সাম্যবাদী ও পক্ষপাতিত্ব রহিত এক মহান সংবাদপত্র গোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের দাবি করেন। বাংলা সংবাদপত্র গোষ্ঠী ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার নির্লজ্জ তোষণ আজ সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে।

উত্তর প্রদেশে কুকুর বিড়াল মরার ঘটনায় এদের যতটা উদ্বিগ্ন হতে দেখা যায় তার সিকি ভাগ দেখা যায় না এই রাজ্যে মা-বোনেদের উপর হিংস্র আক্রমণে। উত্তরপ্রদেশে গণপিটুনিতে হত্যা ধিক্কারযোগ্য হলেও পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ঘটা অ্যাসিড আক্রমণ, ধর্ষণ, খুন, জীবন্ত পোড়ানো সাধারণ ঘটনা। এগুলোর উপর আর্টিক্যাল লিখলে বা সচিত্র খবর প্রকাশ করলে রাজ্যের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি হবে — এই কুযুক্তি তারা দিয়ে থাকে। যদিও ঝাড়খণ্ড রাজ্যে চুরির অভিযোগে ধরাপড়া যুবকের উপর গণপিটুনির ঘটনা ছবি-সহ ফলাও করে পরিবেশিত হয়। এতে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি বিঘ্নিত হয় না? হায়দরাবাদের রোমহর্ষক গণধর্ষণ ও জীবন্ত জ্বালিয়ে দেবার ঘটনায় দেশ তোলপাড় হয়, দিল্লির নির্ভয়াকাণ্ডে ধর্ষিতা দেরিতে হলেও বিচার পায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কামদুনীর হতভাগ্য ধর্ষিতা ও খুন হয়ে যাওয়া বোনের খুনিদের বিচার এখনও অধরা। হলদিয়ার মা ও মেয়েকে ধর্ষণ ও জ্বালিয়ে দেওয়া চাপা পড়ে যায় কোনো এক নেপথ্য নির্দেশে। এখানেও অভিযুক্ত একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের। অতএব এগনো যাবে না। ২০১৬-এর ডিসেম্বরে হাওড়ার ধুলাগড়ে দুদিন ধরে পুলিশের উপস্থিতিতে হিন্দুদের ঘরবাড়ি, দোকন লুঠপাট এবং তাতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। রাজ্যের কোনো সংবাদপত্র এই খবর প্রকাশ করেনি। জাতীয় নিউজ চ্যানেল 'জি নিউজ'-এর কভারেজ দেয়। এটি বাঙ্গালির নির্লজ্জ আত্মসমর্পণের এক বড়ো নমুনা। যে বাঙ্গালি একদিন নির্ভীকতার সঙ্গে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে কলম ও পিস্তল ধরেছে আজ তাদেরই এক বড়ো অংশ প্রশাসকের ধামাধরা হয়ে বসে আছে। পুস্তি, মহেশতলা, ক্যানিং, চন্দ্রকোণা, চন্দননগর, সমুদ্রগড়, কাটোয়া, কালিয়াচক, দেগঙ্গা এরকম বহু জায়গা যেখানে শান্তিপ্রিয় হিন্দুরা একতরফাভাবে আক্রান্ত হয়েছে। তাণ্ডবলীলার পর পুলিশি হস্তক্ষেপ। এ যেন গোদের উপর বিষফোঁড়া। যারা আক্রান্ত তাদের ধরে লকআপে পোরা যেখানে আক্রমণকারীরা প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরে বেড়ানোর ছাড়পত্র পায়। এতে হিন্দুদের মনোবল আরও ভেঙে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে সংবাদপত্র সঠিক ঘটনা তথ্যনিষ্ঠভাবে কাগজে তুলে ধরলে দুষ্কৃতী-মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত হতে পারে। আক্রান্তরা যাতে সুবিচার পেতে পারে তার জন্য লেখালেখি বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে টক-শো আয়োজন করা যেতে পারে। কিন্তু এসব ঘটনার উপর লেখালেখি বা আলোচনা নৈব নৈব চ। দিনের পর দিন 'ঘণ্টা খানেক সঙ্গে সুমন' জাতীয় শো চলতে পারে যদি বিষয়টিতে মানবতা (পড়ুন বিশেষ এক

আমাদের মতো সাধারণ বাঙ্গালির বিশ্বাস আমরা যখন ৩৪ বছরের রাজনীতিক -বুদ্ধুজীবী আঁতাত ভাঙতে পেরেছি, এও ঠিক পারব। সরকার পালটানোর সম্ভাবনা তৈরি হলে এঁরা আবার সবার আগে শিবির পালটে নামাবলী পালটে নেয়।

সম্প্রদায়ের কোনো দুষ্কৃতী) আক্রান্ত হয়ে থাকে। আমরা রাজ্যবাসী এরকম অনেক ঘটনা বা অতিনাটকের সাক্ষী।

২০০৭ সালে কলকাতায় রিজওয়ানুর রহমান নামে এক যুবক প্রণয়ঘটিত হতাশার কারণে আত্মহত্যা করলে সেই ঘটনাকে নিয়ে মাসধিককাল ব্যাপী হাজার হাজার মোমবাতি জ্বালানো হয়। সুদূর দিল্লির কোনো সাধারণ মারামারির ঘটনা, হরিয়ানার ক্রিকেট খেলা ঘিরে অশান্তির কথা ফলাও করে বাংলা কাগজে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এমনকী আমেরিকার সাধারণ নির্বাচনে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের গোপন যোগাযোগ, আইসিস আক্রমণের মুখে নিরাপদ দেশে পলায়নরত সিরীয়দের দুর্দশা এগুলো সবিস্তারে এমনভাবে প্রকাশিত হয় যেন আমার দেশে বা প্রতিবেশী দেশে এক অসীম অনন্ত শান্তি বিরাজমান। পাশের বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন ও পুরোহিতদের হত্যা এদের হৃদয় স্পর্শ করে না। আইলান কুর্দির ছবি, ধ্বংসপ্রায় সিরীয় কোনো জনপদের ছবি দিয়ে মানুষের আবেগে সুড়সুড়ি দিতে এরা ওস্তাদ। মধ্যপ্রাচ্যে আক্রান্ত মানবতা সম্পর্কে এদের লেখা বেরোয় কিন্তু আইসিস আক্রমণকারীদের বিষয়ে কোনো কথা থাকে ন। এদের এ জাতীয় একদেশদর্শিতার কারণে আজ সাধারণ বাঙ্গালি পাঠক ও দর্শক বিরক্ত। তারা এর ফলে জাতীয় হিন্দি ও ইংরেজি গণমাধ্যমগুলো দ্বারা বেশি বেশি করে আকৃষ্ট হচ্ছেন। কারণ বাঙ্গালির মধ্যে একটা সহজাত জাতীয়তাবোধ এখনও রয়ে গেছে যার সূচনা করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। দীর্ঘ ৩৪ বছরের বামশাসন ও বর্তমানে দিদির শাসনেও বাঙ্গালির সেই সত্তায় জং ধরেনি।

এবার আসি বাঙ্গালি বাম বুদ্ধিজীবীদের কথায়। যে কোনো সভ্যদেশে (সভ্যদেশে এ কারণে বলছি কেননা সেনা ও রাজশাসনাধীন বা উগ্রধর্মাশ্রয়ী দেশে সংবাদপত্রের ভূমিকা থাকে নকলেই)।

সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বড়ো ভূমিকা থাকে জনমত গঠনে। আর মিডিয়ার মাধ্যমে যাঁরা তাদের শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে একাজ সুচারুরূপে করতে পারেন তারাই হলেন সচেতন নির্লোভ বুদ্ধিজীবী। ছবি, সংগীত, নাটক ও কবিতার মাধ্যমে তাঁরা যে কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক অসাম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্মোহ বিবেকবোধে কাজ করতে পারেন। দীর্ঘ ৩৪ পর বছর এদের শীতঘুম ভেঙেছিল সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। এখন মানুষ বুঝতে পারে আসলে বাম প্রশাসক ও নেতৃত্বের কাছ থেকে এদের আর পাবার কিছু ছিল না। এখন এদের এঁটেল গুড়ে মাছি পড়ার দশা। বিবেকের দংশনে ডানা ঝাপটানো ছাড়া এদের উপায়ন্তর নেই। সুমিষ্ট গুড় (সরকারি খেতাব, পদ ও আর্থিক পাওনাগণ্ডা) একটু একটু করে শুষে খাচ্ছেন আর থেকে থেকে গুড়ের মহিমাকীর্ত্তন করছেন এইসব মিডিয়ার মাধ্যমে। বক্তব্যে, যুক্তিতর্কে এরা এমন ধারালো যেন হবস্, লকস্, ভল্টেয়ার এদের পকেটে থাকে। পারলে আরেকটা ফরাসি বিপ্লব এরা এরাজ্যে ঘটিয়ে ছাড়বে। এরা হরেক মতের হলেও হিন্দুত্ব তথা জাতীয়তাবাদ বিরোধিতার ক্ষেত্রে এরা একত্রিত। রাজনৈতিক প্রভুদের ক্ষমতায়নের জন্য এরা অলআউট খেলতে পারেন। কিন্তু অসম সাহসী জাতীয়তাবাদী নামগোত্রহীন কোনো ব্যক্তি কোদালটাকে কোদাল বলার সাহস দেখালে উপস্থিত সকলে মিলে তার দিকে রে-রে করে ওঠেন। গোধরায় করসেবকদের জীবন্ত জ্বালিয়ে দিলে, দিল্লিতে অঙ্কিত শর্মাকে নৃশংসভাবে কোপানো হলে, হিন্দুর দোকান, পেট্রোল পাম্প জ্বালিয়ে দিলে, মন্দির ভাঙচুর করলে এদের ঘুম ভাঙে না। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে এরা নড়ে চড়ে বসেন। এদের কলম তখন বিপন্ন মানবিকতার হয়ে লড়াই শুরু করে দেয়। যে কোনো লিঞ্চিংই মহা অপরাধ ও চরম শাস্তিযোগ্য, কিন্তু এরা কাঁটা বেছে খাওয়াতে পারদর্শী। রাজনৈতিক মনিব বা আন্তর্জতিক এন্ডোর্সারা যে যে বিষয় নির্বাচন করে দেবেন শুধুমাত্র সেগুলো নিয়েই এদের কারবার। উত্তরপ্রদেশে মব লিঞ্চিং হলে তা হলো জঘন্য অপরাধ, দেশ অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে ইত্যাদি। এই উগ্রদেশ বসবসের অনুপযুক্ত। সমস্ত সরকারি খেতাব ফিরিয়ে দাও। সমস্ত শক্তি দিয়ে এই উগ্রতার বিরোধিতা করা জরুরি। কিন্তু কংগ্রেসশাসিত অসমে, সপা শাসিত উত্তরপ্রদেশের মজুফরনগরে, কংগ্রেস শাসিত মহারাষ্ট্রের গড়চিরেলিতে হিন্দু ও হিন্দু সাধুরা আক্রান্ত ও হতাহত হলে সেগুলো অতি তুচ্ছ ঘটনা।

১৯৮২ সালে বাম শাসনে কলকাতার বিজন সেতুতে ছেলেধরা গুজব ছড়িয়ে ১৭ জন নিরীহ আনন্দমার্গী অবধূতকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনায় আজও অবধি কোনো অপরাধী বা বাম মোড়লের শাস্তি হয়নি। পালঘর কাণ্ডে সাধুহত্যার ঘটনায় অপরাধী ও তাদের মদদদাতা বাম মাতব্বরদের শাস্তি হবে কি না তা সময় বলবে। কিন্তু মানুষ সব দেখছে। পেটোয়া সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া যতই চেপে যাওয়ার চেষ্টা করুক, চাপা দেওয়া আজ আর কোনো ভাবেই সম্ভব না। কারণ সামাজিক মাধ্যম আজ ছবি-সহ সমস্ত বিষয় পরিষ্কার করে দিচ্ছে। ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া আজকের মতো সক্রিয় ছিল না এবং সামাজিক মিডিয়া তো ছিলই না। এর সুযোগ নিয়েছে তদানীন্তন বাম শাসক ও তাদের পৌষ্য উচ্ছিষ্টভোগী বুদ্ধিজীবীরা। এরা দুটো বিষয় মাথায় রেখে কাজ করেন। আক্রমণকারী বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত হলে এবং আক্রান্ত ব্যক্তি বা জনগণ হিন্দু হলে এদের কলমের কালি শুকিয়ে যায় বা গলা থেকে শব্দ বেরোয় না। ইসলামপুরের দাঁড়িভিটে ছাত্রদের গুলি করে মারলে বা বসিরহাটের সরকারি পক্ষপাতিত্বের শিকার অভুক্ত সাধারণ গরিব মায়েরা বিক্ষোভ দেখিয়ে পুলিশ দ্বারা নির্মম অত্যাচারিত হলে এদের না টিভি পর্দায় না কাগজে খুঁজে পাওয়া যায়। অপরপক্ষে, শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী, উগ্র বিশেষ সম্প্রদয়ের ধর্মসভায় অসভ্যতা চরম সীমা লঙ্ঘন করলেও এরা তাদের হয়েই গলা ফাটায়। অর্থের কী মহিমা। এরাজ্যের সব চাটুকার বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়া হাউসের এই জঘন্য ন্যক্কারজনক ক্রিয়াকলাপ বাঙ্গালি যে বেশিদিন সহ্য করবে না তার লক্ষণ আজ সমাজে ক্রমশ পরিষ্কার হচ্ছে। আমাদের মতো সাধারণ বাঙ্গালির বিশ্বাস আমরা যখন ৩৪ বছরের রাজনীতিক বুদ্ধুজীবী আঁতাত ভাঙতে পেরেছি, এও ঠিক পারব। একটু পেছনের দিকে তাকালে দেখা যাবে এঁরা পাবলিকের ধরা ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে অবস্থান করে। অর্থাৎ সরকার পালটানোর সম্ভাবনা তৈরি হলে এঁরা সবার আগে শিবির পালটে নামাবলী পালটে নেয়। মানুষের প্রশ্ন, এরাজ্যে বুদ্ধিজীবীরা ও সংবাদপত্র আর কতদিন দাসত্ব করবে। বুদ্ধিজীবীদের ও সংবাদপত্রের সম্পাদক ও নিউজ চ্যানেলের কর্তাদের বোঝা উচিত নিজেদের সাহস থাকলে রাজনীতিকরাই তাদের নিকট আসবে, তাঁদের ধরনা দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। সংবাদপত্র সম্পর্কে আর্থার মিলারের কথা দিয়ে শেষ করবো— 'A good newspaper, I suppose, is a nation talking to itself।'

ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের চক্রান্তে বিস্মৃত রাধানাথ



শুক্লা সিকদার

আগামীকাল আপনি যদি শোনেন পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের নাম মাউন্ট এভারেস্ট নয়, মাউন্ট রাধানাথ কিংবা মাউন্ট শিকদার — তাহলে আপনি নিশ্চয়ই খুব অবাক হবেন?

এই নিবন্ধকারের অনুরোধ, অবাক হবেন না। কারণ, এর থেকেও বড়ো বিস্ময় আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

তবে আপনাকে বলে রাখি যে, আপনার বিস্ময় হওয়ার কারণ হলো পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম মাউন্ট এভারেস্ট হওয়ায়। প্রকৃত সত্য এই যে, মাউন্ট এভারেস্ট নামকরণের নেপথ্যে রয়েছে এক সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ইতিহাস যা আজও বয়ে নিয়ে চলেছে ভারতবাসী ও ভারতবর্ষ।

ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে ভারতে ব্রিটিশদের পরিচালিত গ্রেট ত্রিকোণমিতিক সার্ভের দেরাদুনের দপ্তরে কম্পিউটারের পরিষেবা দেওয়ার সুদীর্ঘ কর্ম অভিজ্ঞতার পর কলকাতার যুবক রাধানাথ ষিকদার কলকাতায় ফিরলেন। নিজের জন্মনগরী কলকাতাতে তিনি যোগ দিলেন গ্রেট ত্রিকোণমিতিক সার্ভের বরিষ্ঠ গণনাকারী এবং আবহাওয়া বিভাগের মুখ্য নিয়ন্ত্রক হিসেবে। ব্রিটিশ আধিকারিকরা প্রশাসনিক কারণেই সেই সময় কৌতূহলী ছিলেন হিমালয়ের ভৌগোলিক ও পরিমাপগত খুঁটিনাটি জানার বিষয়ে। তারা কিছুটা বিস্মিতও ছিলেন এই ভেবে যে, ভারতীয়রা আধ্যাত্মিক কারণে হিমালয়ের পুজো করলেও হিমালয়ের ভৌগোলিক কিংবা পরিমাপগত খুঁটিনাটি নিয়ে সেই অর্থে কখনো ব্যতিব্যস্ত হয়নি। যদিও ভারতীয় অধ্যাত্মচর্চার পীঠস্থান হিসেবে হিমালয়ের প্রতি ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্রিটিশরা কখনোই গুরুত্ব দেয়নি। ঠিক তেমনি প্রাচীন ভারতীয় পর্যটকদের বর্ণিত ভৌগোলিক খুঁটিনাটিও ব্রিটিশদের কাছে গুরুত্ব পায়নি। তবুও প্রশাসনিক নির্দেশে পরে হিমালয়ের পরিমাপগত দস্তাবেজ তৈরি করতে ব্রিটিশ প্রশাসনিক কর্তাদের শরণাপন্ন হতে হলো রাধানাথ শিকদার নামের এক ভারতীয় বাঙ্গালি গণিতজ্ঞের কাছেই।

তবে ব্রিটিশ প্রশাসন যোগ্য সম্মান ও প্রাপ্য স্বীকৃতি না দিলেও রাধানাথ শিকদারের গাণিতিক প্রতিভাকে মান্যতা দিতে জার্মান দার্শনিক সোসাইটি ১৮৬৪ সালে তাকে সাম্মানিক সদস্যপদ দিয়েছিল, যা তখনকার সময় খুবই দুর্লভ সম্মান ছিল। এছাড়াও নিজের দেশ ভারতের ডাক বিভাগ ২০০৪ সালের ২৭ জুন ভারতীয় ত্রিকোণমিতিক সার্ভের উপর একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিল। যাতে ভারতীয় ত্রিকোণমিতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী রাধানাথ শিকদারের চিত্র প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এইটুকুই, হিমালয়ের পিক এক্সভি পর্বতের উচ্চতা নির্ণয়ে এবং সেটিকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গের শিরোপা দিতে ভারতীয় এই গণিতজ্ঞের অবদান প্রাপ্য স্বীকৃতি পায়নি ব্রিটিশ প্রশাসনিকদের কাছে। এমনকী তার নিজের দেশ স্বাধীন ভারতের পাঠ্যপুস্তকেও তিনি ব্রাত্য। খুব কমসংখ্যক ভারতীয়ই পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের আবিষ্কর্তা হিসেবে রাধানাথ শিকদারকে জানেন

সালটা ছিল ১৮৫২। ভারতে তখন ব্রিটিশ রাজত্বের মধ্যযুগ। ব্রিটিশ প্রশাসন তখন ভারতকে আরও সুদৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ করার জন্য ভারতের ভৌগোলিক সীমা পরিসীমা নির্ধারণ করে মানচিত্র তৈরিতে ব্যস্ত। তখন রাধানাথ সিকদার নামে একজন ভারতীয় বাঙ্গালি গণিতজ্ঞ গ্রহণ করেন পরিত্রাতার ভূমিকা। সর্বপ্রথম রাধানাথ শিকদারই হিমালয়ের ছটি চূড়ার উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ গাণিতিক পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহার করে নিকলসন পরিমাপ পদ্ধতির ভিত্তিতে জানিয়ে দেন যে তৎকালীন পিক-এক্স-ভি ই পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। সঠিক গাণিতিক উচ্চতা পরিমাপের আগে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতশৃঙ্গকেই পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ বলে গণ্য কর হতো। ১৮৪৩ থেকে ১৮৫০ সাল এই দীর্ঘ সময়কাল ধরে তিনি পিক-এক্স-ভি-র উচ্চতা নিরুপণে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে পিক-এক্স-ভি-র উচ্চতা নির্ণয় করার পরেও তিনি আরও দুবছর সময় নিয়েছিলেন সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য। দ্বিধাহীনভাবে নিশ্চিত হওয়ার পরই ১৮৫২ সালে তিনি পিক-এক্স-ভি-র উচ্চতা ২৯০০০ ফুট বলে তথ্যপ্রমাণ ও গাণিতিক তত্ত্বের ভিত্তিতে তার বিবৃতি দেন। যদিও ব্রিটিশ প্রশাসন রাধানাথ শিকদারের এই নির্ণয়কে সরকারিভাবে মান্যতা দিতে আরও চার বছর সময় নিয়েছিল। শেষমেষ ১৮৫৬ সালে ব্রিটিশ প্রশাসনিক এন্ড্রু স্কট ওয়াঘ রাধানাথ শিকদারের নির্ণয়ের উপর ভিত্তি করেই তৎকালীন পিক এক্স-ভি-কে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ হিসেবে ঘোষণা করেন। যা পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের স্থানে অধিষ্ঠিত করে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অনামি এক পর্বতশৃঙ্গকে। অবসান বহুল প্রচলিত ভুল ধারণার এবং জানা গেল যে, ৮৫৮২ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা নয়, পিক এক্স-ভি-ই পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। স্বীকৃতি পাওয়ার পরই পিক এক্স-ভি-র একটি মানানসই নামকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তৎকালীন ব্রিটিশ প্রশাসক এন্ড্রু ওয়াঘ এবং তিনি তার পূর্ববর্তী

আধিকারিক ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেল স্যার জর্জ এভারেস্টের নামে নামকরণ করেন পিক-এক্স-ভি-র।

স্যার জর্জ এভারেস্ট, যিনি কিনা কোনোরকম ভাবেই তৎকালীন পিক এক্স-ভি অর্থাৎ বর্তমান মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা নির্ণয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তিনি তার জীবদ্দশায় কোনোদিনও পিক এক্স-ভি-র ধারেকাছেও যাননি, তার নামেই নামাঙ্কিত হয়েছিল পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। রচিত হয়েছিল ব্রিটিশদের মনস্তাত্ত্বিক সাম্রাজ্যবাদের আরেক অধ্যায়। আর বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গিয়েছিল সেই মানুষটির নাম যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গাণিতিক সূত্রের ভিত্তিতে পিক-এক্স-ভি-র প্রকৃত উচ্চতা নিরূপণ করেছিলেন। যে রাধানাথ শিকদারকে খুঁজে পাওয়াকেই স্যার জর্জ এভারেস্ট তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করতেন, ভারতীয় উপমাদেশের সার্ভেয়র জেনারেল হিসেবে স্যার জর্জ এভারেস্ট তার অধস্তন রাধানাথ শিকদারের অকুণ্ঠ প্রশংসা করতেন এবং বিভিন্ন সময়ে তার বক্তব্যে ও লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে রাধানাথ শিকদার সম্পর্কে তার সপ্রশংস উদ্ধৃতি। স্যার জর্জ এভারেস্টের ভাষায় ও লেখনীতে সিকদার ছিলেন একজন 'hardly, energetic young man, ready to undergo any fatigue and acquire a practical knowledge of all parts of his profession'. 'There are a few of my instruments that he cannot manage; and none of my computations of which he is not thoroughly master. He can not only apply formulate but investigate them.'

কলকাতার শিকদার গ্রেট ত্রিকোণিমিতিক সার্ভের প্রকল্পসমূহে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সমস্ত গণনা ও পরিমাপের কাজে পারদর্শিতার জন্য 'কম্পিউটার' পদে সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে সুদক্ষ বিচক্ষণ এই গণনাকারীই প্রধান কম্পিউটার বা প্রধান গণনাকারীর ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

শিকদারকে সমর্পণ করা কাজে গাণিতিক দক্ষতার একান্ত প্রয়োজন ছিল এবং অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা এবং স্বকীয়তার সঙ্গে সেই কাজ সম্পন্ন করার জন্য সার্ভেয়ার জেনারেল স্যার জর্জ এভারেস্টের কাছে শিকদার বিভিন্ন সময়ে প্রশংসিত হয়েছিলেন। স্যার জর্জ এভারেস্ট সিকদারকে বলতেন 'a mathematician of rare genius.

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ জন কয় যিনি ওই বিষয়ে দুটি বইও লিখেছিলেন তিনি বিবিসি নিউজকে দেওয়া তার সাক্ষাৎকারে সিকদারের সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'His greatest contribution to the computation was in working out and applying the allowance to be made for a phenomenon called refraction–the bending of straight lines by the density of the Earth's atmosphere.' সেই রাধানাথ শিকদারের অক্লান্ত পরিশ্রম, গাণিতিক জ্ঞান বুদ্ধিমত্তা পেল না যোগ্য স্বীকৃতি।

প্রখর গণিতজ্ঞ রাধানাথ সিকদারের জন্ম ১৮১৩ সালে বৃহত্তর কলকাতায় । তিনি কলকাতার বিখ্যাত হিন্দু কলেজে (বর্তমান প্রেসিডেন্সি ইউভার্সিটি) তাঁর গাণিতিক অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করেছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি গণিতের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিতেও সাবলীল ছিলেন। কর্মপিপাসু শিকদার তাঁর জীবদ্দশায় ব্যক্তিগত ভাবে কখনো সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করেননি, বরঞ্চ তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন জটিল গাণিতিক সমাধানে। যে গাণিতিক সমাধান সূত্রের মাধ্যমেই সিকদার তাঁর ৩৯ বছর বয়সে পিক এক্স-ভি-কে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ রূপে আবিষ্কার করেছিলেন।

তবে রাধানাথ সিকদারের সেই সাফল্যের পশ্চাদপটে ছিল আরও কিছু ঘটনা। সালটা ছিল ১৮০২। পৃথিবীর বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে বিস্ময়কর উদ্যোগগুলির মধ্যে একটি উদ্যোগ শুরু হলো মাদ্রাজে ব্রিটিশ সেনাধক্ষ উইলিয়াম ল্যাম্বডনের মাধ্যমে। উদ্যোগটি পরবর্তীকালে সহস্রাধিক ভারতীয় পরিষেবা প্রদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পের রূপ পেল এবং ১৮১৯ সালে ব্রিটিশ প্রশাসনে গ্রেট ত্রিকোণমিতিক সার্ভে (জিটিএস) নামে নথিভুক্ত হলো।

গ্রেট ত্রিকোণমিতিক সার্ভের মাধ্যমে ১৬০০ বর্গমাইল অঞ্চলের ভৌগোলিক মাপজোপ সম্পূর্ণ করা হয়েছিল এবং সক্রিয়ভাবে ৫০ বছর ধরে চলা সেই পুরো প্রকল্পটি পরিচালিত হয়েছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের অধীনে ভারতীয় পরিষেবা প্রদানকারীদের পরিশ্রম এবং মেধার উপর ভিত্তি করে। বহু ভারতীয় কর্মজীবী তৎকালীন ব্রিটিশ প্রশাসনের অন্য আর পাঁচটা সংস্থার মতো গ্রেট ত্রিকোণমিতিক সার্ভের অধীনে কর্মজীবনে স্বীকার করেছিলেন চূড়ান্ত লাঞ্ছনা, সম্মুখীন হয়েছিলেন প্রতিরূপ পরিস্থিতির, অকালে প্রাণত্যাগ করেছিলেন বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে পরিষেবা দিতে গিয়ে। ভারতীয় পরিষেবা প্রদানকারীদের মধ্যে বহু সংখ্যক মানুষ বাঘের আক্রমণ ও ম্যালেরিয়ার কবলে পড়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে কেউই যোগ্য সম্মান কিংবা কর্মদক্ষতা অনুযায়ী পদ ও প্রতিদান পাননি। রাধানাথ শিকদারের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তবে প্রকৃত ইতিহাসকে ম্লান করা গেলেও সম্পূর্ণ মুছে ফেলা যায়নি বলেই হয়তো শিকদারের কৃতিত্ব ও আবিষ্কার লন্ডনের গ্রেট আর্ক এক্সিবিশনের অংশহিসেবে ভাস্বর হয়ে রয়েছে। যা বস্তুত ব্রিটিশদের ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

প্রকৃতপক্ষে মোটামুটি গোটা বিশ্বের সঙ্গে আমরা ভারতীয়রা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের করাল গ্রাস থেকে ভৌগোলিক ভাবে মুক্ত হলেও মুক্ত হতে পারিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী মনস্তত্ত্ব থেকে। তাই আজও আমাদের মননে, চিন্তনে ব্রিটিশ আধিপত্য। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়ার অনতিদূরে আজও ভারতের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই ব্রিটিশ আধিপত্যের মানসিকতা।

সাম্রাজ্যবাদী, স্বার্থপর ব্রিটিশরা ভারতীয়দের প্রতি অন্যায় করতেই পারেন, কিন্তু কজন ভারতীয় আজ মনে রেখেছে রাধানাথ শিকদারকে? কজন উদ্যোগী হয়েছে তার অক্লান্ত পরিশ্রম ও জ্ঞানলব্ধ ফলকে স্বীকৃতি দিতে?

শুধু হাতেগোনা কয়েকটি ঘটনা নয়। বিশ্ব তথা ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে এমন স্মৃতিভ্রমের ঘটনার ছড়াছড়ি, সবক্ষেত্রেই প্রায় ভারতীয়দের এই স্মৃতিভ্রম পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতায় ইন্ধন জুগিয়েছে। আজ একশো তিরিশ কোটি নাগরিকে মুখরিত ভারতবর্ষ হতে পারত নিজের ইতিহাস ও ভারতীয় মহাপুরুষদের কর্মকাণ্ডে গর্বিত এক দেশ। কিন্তু তা না হওয়ার পেছনে কারণ প্রধানত ইতিহাস বিকৃতি ও স্মৃতিবিস্মরণ। নিজেদের গৌরবান্বিত ইতিহাস ভুলে পাশ্চাত্য বশ্যতা স্বীকার, যেন ভারতীয়দের ভবিতব্য হয়ে গেছে। পাশ্চাত্য অন্তঃসারশূন্য গৌরবগাথা ভারতীয়দের মজ্জায় মজ্জায় শিরায় শিরায় ঢুকিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলে আসছে স্মরণাতীতকাল থেকে। আজকের ভারতে আধুনিককরণের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে পাশ্চাত্যের অনুসরণ, অনুকরণ। আজ নিজেদের গৌরবন্বিত অতীত সংস্কৃতির ও বিদ্যাচর্চার উজ্জ্বল অতীত বিস্মরণই অপাংক্তেয় করে রেখেছে রাধানাথ শিকদারের মতো বহু সপ্রতিভ ভারতমাতার সন্তানের প্রতিদানের ইতিহাসকে।

ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ধর্মান্ধতা কেন?

বাকস্বাধীনতার নামে রাষ্ট্রবিরোধী প্রচার আমাদের দেশ ছাড়া আর কোনো দেশে সম্ভব কি না ১০০ শতাংশ রিডাকশন সেলে বিক্রি হওয়া দলীয় 'বুদ্ধিজীবী' ও সংবাদমাধ্যমের থেকে জানার ইচ্ছে রইল।

ড. নারায়ণ চক্রবর্তী

আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীনতা উত্তরকালে যে সংবিধান প্রদত্ত নিয়মে শাসিত হয়, তা নাগরিকদের কয়েকটি অধিকারের কথা বলে। এইসব অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার, যা অলঙ্ঘনীয় বলে চিহ্নিত করা আছে। সাম্যের অধিকার (ধারা ১৪ থেকে ১৮ নম্বর), স্বাধীনতার অধিকার (ধারা ১৯ থেকে ২২ নম্বর), শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (ধারা ২৩, ২৪ নম্বর), ধর্মাচরণের অধিকার (ধারা ২৫ থেকে ২৮ নম্বর), কৃষ্টি ও শিক্ষার অধিকার (ধারা ২৯, ৩০ নম্বর) ইত্যাদি কয়েকটি মৌলিক অধিকার। আজ খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, একটি পরিবারের শাসন ব্যবস্থা প্রথম চল্লিশ বছর (অল্প কিছু সময় বাদ দিয়ে) থাকার সুবাদে ওই পরিবারের নিজস্ব চিন্তন ও লাভ-ক্ষতির নিরিখে দেশের সংবিধান থেকে শাসন ব্যবস্থা, সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। যদি জরুরি অবস্থার সময়ে আমাদের সংবিধানের বৃহত্তম সংশোধনের কথাই ধরা হয়, দেখা যায় যে ওই ৪২ তম সংশোধনে (১৯৭৬ সালে) আমাদের স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের ধর্ম এসে গেল। সেটা কী? 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র। কেউ কিছু বুঝল না। অর্ধশিক্ষিত, স্বার্থান্বেষী আমলা ও রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা গুণগান করতে লাগল। কিন্তু আসলে কী হলো?

'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র হিসেবে ভারতকে ঘোষণা করা হলো— এর একটিই অর্থ যে ধর্মহীন রাষ্ট্র! তার মানে দাঁড়াল, ধর্ম সম্পর্কে আমাদের সংবিধানে যে ব্যাখ্যা ও তার অধিকার দেওয়া হয়েছে ২৫ ও ২৬ নম্বর ধারায়, তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা। সুতরাং এই ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের সংবিধান বিরোধী। নিন্দুকেরা বলবেন 'আপনি ধর্মের আফিমগোলা খাওয়াতে চাইছেন'। আমি শুধু সবিনয়ে বলতে চাই অর্ধশিক্ষিত ও জেগে ঘুমানো মানুষদের আমি ঘুম থেকে জাগাতে চাই না— শুধু সত্যিটা সমাজের কাছে তুলে ধরছি।

আমরা জেনে এসেছি যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হলে তাদের বিদ্যাচর্চা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও তার পরিচালনা ওই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দ্বারা ধর্মীয় রীতি মেনে সংঘটিত হবে। এর জন্য সরকারি কোষাগার থেকে সরকারি অনুদান ওই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দ্বারা ধর্মীয় রীতি মেনে সংঘটিত হবে। এর জন্য সরকারি কোষাগার থেকে সরকারি অনুদানও দেওয়া হয়। সরকার ইচ্ছে করলে অনুদান দিতেই পারে। কিন্তু যেটা বলা হচ্ছে যে, তা সংবিধান স্বীকৃত, সেটা ঠিক নয়। বরঞ্চ সংবিধানের ১৫ নম্বর ধারা বলছে যে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার। 'The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them'।

'ধর্মীয় সংখ্যালঘু' শব্দ আমাদের সংবিধানে নেই। কারণ সংবিধান সমস্ত নাগরিকের কথা বলছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণ একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। এই সংরক্ষণ নিয়ে আমার ব্যক্তিগত আপত্তি নেই। কিন্তু সংবিধানের দোহাই দিয়ে সেটা লাগু করা বস্তুত রাজনৈতিক হঠকারিতা এবং সংবিধান অনুযায়ী নাগরিকদের সঙ্গে দ্বিচারিতা। এই প্রসঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে কিছু রাজনীতিক পদাধিকারীদের অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ডের দায় দেশের সাধারণ মানুষের উপর বর্তেছে যা আমাদের সমাজ ও সর্বোপরি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত হেনেছে। সঠিক চিন্তা ভাবনার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার রাষ্ট্র বললে বলতে হয় যে রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে স্বীকার করে না। অর্থাৎ রাষ্ট্রের কোনো ধর্মীয় ভাব নেই। কিন্তু তা আমাদের সংবিধানের ২৫ ও ২৬ নম্বর ধারা দুটি, যাদের ধর্মাচরণের ব্যাখ্যা হিসেবে ধরা হয়, তার পরিপন্থী। ২৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী আমাদের দেশে যে কোনো ধর্মীয় (সংখ্যালঘু নয়) আচার, আচরণ এবং ধর্ম সম্প্রচারে বাধা দেওয়া যাবে না। ২৬ নম্বর ধারায় বলা আছে যে সব ধর্ম (এক্ষেত্রেও কোনো সংখ্যালগুরু বা সংখ্যালঘু ধর্ম নয়) স্বাধীনভাবে পরিচালনা করা যাবে। তাহলে সেকুলারিজমের নামে তথাকথিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক

আইন অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি ও সেখানে সরকারের অনুদান, যা সকল নাগরিকের দেওয়া করের টাকা, সংবিধানগত ভাবে বৈধ নয়। আর যদি তা করতে হয় তবে অবশ্যই তথাকথিত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জন্যও একই ব্যবস্থা রাখতে হবে— সেটাই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কাজ।

আমাদের সংবিধানের শুরুতে রাষ্ট্রের উল্লেখে বলা হয়েছে, 'Sovereign Socialist Secular Democratic Republic'। এই নামটি কতগুলি বিশেষণের অর্থহীন সমাহার। আমাদের প্রাক্তন ল' কমিশনের সদস্য P. M. Bakshi তাঁর The Constitution of India বইটিতে সেকুলারিজম সম্বন্ধে বলেছেন, আমাদের রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম নেই, সব ধর্মকেই রাষ্ট্র সমান মর্যাদা দেয়। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তাঁর Recovery of Faith বইতে বলেছেন যে সেকুলারিজমের অর্থ তার আক্ষরিক মানেতে নয়, অর্থাৎ ধর্মশূন্য রাষ্ট্র নয়, আমরা সব ধর্মকেই সমমর্যাদা দেব। কোনো একটি বিশেষ ধর্মকে বিশেষ ভাবে প্রমোট করব না। সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য জজ Hansaria (A.S. Narayan v. State of Andhra Pradesh, AIR 1996 SC 1765) religion ও dharma-র তফাৎ বোঝাতে মন্তব্য করেন, 'religion is enriched by visionary methodology and theology, whereas dharma blooms in the realm of direct experience.'।

আমাদের দেশ সর্বদা ধর্ম মেনে পরিচালিত হয়েছে। সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ কখনোই নয়। কিন্তু এই শব্দটি সংবিধানে প্রয়োগের পরে পরেই বিভিন্ন ধর্মাচরণকারী নাগরিক সমাজে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা হতে লাগল। মহামান্য জজ Hansaria-র বক্তব্যে পরিষ্কার ভাবে ধারণা হয়েছে যে, ধর্ম ও রিলিজিয়ন দুটি আলাদা বিষয়। আমাদের সংবিধানে ধর্ম ও ধর্ম সম্পর্কে বলা আছে। সিস্টার নিবেদিতার ১৯১৫ সালে প্রকাশিত বই 'Religion and Dhama'-তে স্বামী বিবেকানন্দের এই শিষ্যা খুব সুন্দর ভাবে এই দুটি বিষয়কে ব্যাখ্যা

দেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রধর্ম ও রাষ্ট্রস্বার্থ রক্ষায় বিশেষ রিলিজিয়নকে গুরুত্ব দেওয়া বন্ধ না করা হয়, যদি রিলিজিয়নের ভিত্তিতে কল্পিত সংখ্যালগুরু ও সংখ্যালঘু তত্ত্বে দেশের নাগরিকদের বিভাজিত করা বন্ধ না হয়, তাহলে রাষ্ট্রের আকাশে দুর্যোগের মেঘ অবশ্যাম্ভাবী।

করেছেন। সমাজ ও জীবন যাপনের জন্য যে সুস্থ দর্শন তারই প্রকাশ ধর্মে— এটি একটি সনাতন দর্শন। একেই আমাদের সংবিধানে গৃহীত ধর্ম বলা হয়েছে। আর কৃষ্টি, সভ্যতার সঙ্গে পরিবর্তনশীল সমাজে একটি ভঙ্গুর ঈশ্বরচিন্তার স্থান হচ্ছে রিলিজিয়ন। বলা যেতে পারে, এই ভিন্ন ভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভের মাধ্যম হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন রিলিজিয়ন। অবিনশ্বর সর্বশক্তিমান, যে আত্মার মণিকোঠায় অবস্থান করে তা হলো ধর্ম--- যা একমেবাদ্বিতীয়ম্। এটি সম্পূর্ণ রূপে ভারতীয় দর্শন। সেখানে রিলিজিয়নগত, জাত ও জাতিগত কোনো তফাত নেই, নেই কোনো বিদ্বেষ। রিলিজিয়নগত বৈষম্য ও তৎপ্রসুত বিদ্বেষ সম্পূর্ণ ভাবে ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠী স্বার্থের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

এরপর জরুরি অবস্থা ও তার পরবর্তী সময় থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা নামের একটি ভুলভাল শব্দ প্রয়োগে আমাদের ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে ভেদাভেদ ও হিংসার রাজনীতির পরিবেশ তৈরি করা হলো। কিছু ভাড়া করা মানুষজনকে 'বুদ্ধিজীবী' তকমা দিয়ে সাধারণ মানুষজনকে বোঝানোর কাজে তাদের লাগানো হলো। একাজে সহায়তা করতে লাগল কিছু সংবাদমাধ্যম। এরা অবাস্তব ও অযৌক্তিক কথা এবং পৌত্তলিকতা বিরোধী বিশেষ রিলিজিয়নের শিকার হয়ে মানুষকে ভুল পথে চালনা করতে লাগল। কিছু বিশেষ রিলিজিয়নের লোকজন ধর্মীয় জিগির তুলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত দিতে লাগল। সেকুলার কথাটা কোনো ধর্মেই ভালো কথা নয়, সেটা প্রচারের বিকৃত প্রভাবের আড়ালে হারিয়ে গেল। আমরা বাইবেলে সেকুলার কথার ব্যাখ্যা পাই তা হলো, 'not regarded as religious, spiritual or sacred. Not belonging to a religious order not bound by monastic vows'। সুতরাং একজন জেসুইট কখনো সেকুলার নন। আবার মুসলমানদের মধ্যে ধারণা দেওয়া হয়েছে যে, বিধর্মীদের ধর্মান্তরিত করা ও তাদের হত্যা করার মধ্যে ধর্মীয় অনুমোদন আছে। এটাও রাজনৈতিক স্বার্থ ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য প্রসূত। ইসলামে dhimmi বলে একটি আরবিক শব্দ পাওয়া যায়, যার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে এই গোষ্ঠী একটি মুসলমান রাষ্ট্রের অমুসলমান সমাজ যারা আইনত 'protected person'। কিন্তু কালক্রমে শক্তিশালী ইসলামি ধর্মীয় গোষ্ঠী এই মানুষদের উপর অত্যাচারের ফতোয়া আরোপ ও তার পরিমাণ বাড়াতে থাকে শেষে ইরানের আয়েতুল্লা খোমেইনি সরাসরি dhimmi শব্দটাকেই বাদ দিলেন। ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ আধুনিক যুগে গতি পাওয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায়, শুধু ভারত নয়, ইসলমি মৌলবাদ মাথাচাড়া দিল। ভারতে কমিউনিস্টরা এই মৌলবাদকে পরোক্ষ সমর্থন করে নিজেদের জনসমর্থন অনেকটাই নষ্ট করল। তাদের

সম্পর্কে বলার সময় একটি বিশেষণ 'ইসলামিক ধর্মনিরপেক্ষ' প্রয়োগ করা হতে লাগল।

এমন রাষ্ট্র পাওয়া যাবে না যার কোনো রাষ্ট্রধর্ম নেই। একমাত্র সব রিলিজিয়ন বিরোধী কয়েকটি কমিউনিস্ট দেশ আছে। সেক্ষেত্রে তাদের রাষ্ট্রধর্ম সেটাই। একেই সেকুলার বলা যায়। কিন্তু সেকুলার মানে 'সর্বধর্মের সহাবস্থান 'এমন উদ্ভট কথা কোনো যুক্তিতেই গ্রহণ যোগ্য নয়। সেকুলার মানুষ মূর্তি পূজার বিরোধী, কিন্তু তারা ইসলাম বা খ্রিস্টীয় আচার আচরণের বিরোধী নয়— এমন অদ্ভুত অবস্থান নেওয়ায় ভারতে কিছু রাজনৈতিক দল ও কিছু নেতা প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে।

সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা বিদ্যাচর্চার স্থান দেওয়া হলো। তাদের সরকারি তত্ত্বাবধানের বাইরে রেখে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা হলো। একটি বিশেষ ধর্মের, বলা ভালো হিন্দুধর্মের, ক্ষেত্রে এমন শিক্ষাদানের অনুমতি দেওয়া হলো না। মুড়িমুড়কির মতো ধর্মীয় শিক্ষার স্কুল খুলে চলতে লাগল 'শিক্ষাদান', যা আসলে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজে সুকৌশলে ব্যবহার করা হতে লাগল। ফলস্বরূপ ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পেল। শুরু হলো ধর্মীয় সংঘাত। এর সম্পূর্ণ দায় ওই 'সেকুলার' নামের আড়ালে একটি বা দুটি রিলিজিয়নের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও একটি রিলিজিয়নের উপর বিরূপ মনোভাব দেখানো। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ও আর্থিক অনুদানে 'হজযাত্রা' করানো যেতেই পারে। কিন্তু সরকার একই ভাবে ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের রোম যাত্রার এবং হিন্দুদের হিংলাজ যাত্রার আয়োজন করে না কেন? কৈলাশ যাত্রায় সরকারি সাহায্যে অপ্রতুলতা কেন? জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের তীর্থযাত্রায় সরকার এগিয়ে আসে না কেন? এই দ্বিচারিতা শুধু সংবিধান বিরোধীই নয়, রাষ্ট্রধর্মেরও বিরোধী। ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলের মনে রাখতে হবে যে, এই ধরনের ধর্মীয় বৈষম্য ও অর্থনৈতিক তুষ্টিকরণ উগ্রধর্মীয় উন্মাদনার জন্ম দেয় যা এক সময় রাষ্ট্রের ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দেয়।

একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, রাষ্ট্রস্বার্থ ও রাষ্ট্রধর্ম একটি রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের অবশ্য পালনীয়। এর অন্যথা হলে তা কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যখন সংবিধানে 'সেকুলার' কথা ঢুকিয়ে মুসলমান তোষণ শুরু হলো তখন কোনো হিন্দু নেতা রাষ্ট্রদ্রোহিতার কথা বলেনি। এমনকী স্বর্ণমন্দিরের আকাল তখত উগ্রপন্থী মুক্ত করার পর খালসাজন গোষ্ঠী স্বর্ণমন্দিরে মিলিটারি প্রবেশের জন্য ব্যথিত হলেও কখনো রাষ্ট্রদ্রোহী কথা বলেনি। কিন্তু জম্মু-কাশ্মীরে সংবিধানের ৩৭০ ধারা ও ৩৫-এ ধারা বাতিল করার পর ফারুখ আবদুল্লার মতো বরিষ্ঠ মুসলমান নেতা চীন ও পাকিস্তানের সাহায্যে কাশ্মীরে এই দুটি ধারা লাগু করবেন বলে হুমকি দিলেন। এ তো আন্দোলনের নামে সরাসরি রাষ্ট্রদ্রোহিতা। কিছু রাজনীতিবিদ আবার 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে' স্লোগান যা বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে হতাশাজনিত কারণে জুলফিকার আলি ভুট্টো দিয়েছিলেন, সেটি ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতীয় হয়েও দিচ্ছেন! এরা কী একবারও ভেবে দেখেছেন যে ভারত টুকরো হলে এদের অবস্থান কোথায় হবে।

আবার পশ্চিমবঙ্গের কিছু গোষ্ঠী বাংলাদেশের সঙ্গে মিশে বাঙ্গালী রাষ্ট্রের খোয়াব দেখছেন! ভালো কথা, আপনারা পৃথ্বীরাজ চৌহানের ইতিহাস ভালো করে পড়ে নেবেন। সঙ্গে পড়ে নেবেন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘটে যাওয়া বাংলাদেশের ইতিহাস। আপনাদের খোয়াব দেখার তাহলেই ইতি হবে।

পরিশেষে বলি, ধর্মীয় তোষণ ও অনুদানের নীতি বন্ধ করা প্রয়োজন। যদি দেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রধর্ম ও রাষ্ট্রস্বার্থ রক্ষায় বিশেষ রিলিজিয়নকে গুরুত্ব দেওয়া বন্ধ না করা হয়, যদি রিলিজিয়নের ভিত্তিতে কল্পিত সংখ্যালগুরু ও সংখ্যালঘু তত্ত্বে দেশের নাগরিকদের বিভাজিত করা বন্ধ না হয়, তাহলে রাষ্ট্রের আকাশে দুর্যোগের মেঘ অবশ্যাম্ভাবী। যদি একদেশ, এক নাগরিক, এক আইন ও এক অধিকার নীতি লাগু না হয়, তবে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সার্বভৌম রাষ্ট্র অস্তিত্ব সংকটের মধ্যে পড়বে।

ফ্রান্সের সাম্প্রতিক ঘটনা এবং তার প্রেক্ষিতে ভারত-সহ সারা পৃথিবীতে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার মতো। একদল ধর্মোন্মাদ মুসলমান ফতোয়ার নামে অমুসলমান হত্যায় ব্যস্ত, অন্য মুসলমান সমাজ মৌনব্রত রেখেছে। অন্য ধর্মকে মুসলমান মৌলবাদীরা যখন অপমান করে আমি পৃথিবীর কোনো মুসলমান বা কমিউনিস্টকে তার প্রতিবাদ করতে দেখিনি। এভাবে এরা ধর্মীয় পদ্ধতিগত কারণেই মনুষ্যসমাজে ক্রমশ নিজেদের অপাংক্তেয় করে তুলেছে।

রাষ্ট্রস্বার্থে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে এক সুরে কথা বলার শিক্ষা রপ্ত করতে হবে। এই শিক্ষাটাই আমাদের অনেক নেতার নেই। রাজনৈতিক স্বার্থ, ক্ষমতার লোভ থেকে রাষ্ট্রবিরোধী কাজকে যারা মদত দেবে, তাদের বিরুদ্ধে দেশের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। আরেকটি কথা, বাকস্বাধীনতার নামে রাষ্ট্রবিরোধী প্রচার আমাদের দেশ ছাড়া আর কোনো দেশে সম্ভব কি না ১০০ শতাংশ রিডাকশন সেলে বিক্রি হওয়া দলীয় 'বুদ্ধিজীবী' ও সংবাদমাধ্যমের থেকে জানার ইচ্ছে রইল।

বিশেষ আবেদন

বর্তমান করোনা মহামারীর ভয়াবহ পরিস্থিতিতে স্বস্তিকা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। www.eswastika.com এতে ইন্টারনেট সংস্করণ নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।

স্বস্তিকার সকল প্রচার প্রতিনিধি, পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি বিশেষ আবেদন, আপনারা স্বস্তিকার ইন্টারনেট সংস্করণটি আপনার পরিচিতদের মধ্যে হোয়াটস্অ্যাপ বা ই-মেলের মাধ্যমে পৌঁছে দিয়ে স্বস্তিকার প্রচারে আমাদের সহযোগিতা করুন। ---*ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা*



মুঘলদের অহোম বিজয়ের স্বপ্ন ধূলিসাৎ করেন সেনাপতি লচিত বরফুকন

অনুপ ঘোষ

জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চাইতেও গরীয়ান— উক্তিটি যে মহামানবের সঙ্গে খুব সুন্দর ও যথোপযুক্ত ভাবে প্রযোজ্য তিনি হলেন লচিত বরফুকন। নাম হয়তো বা না শুনেও থাকতে পারেন, কারণ ছোটোবেলা থেকে আমরা যে ইতিহাস পড়ে বড়ো হয়েছি তাতে মুঘল শাসকদের নাম ছাড়া কোনো হিন্দুবীরগাথা শোনার কথাও নয়। ক্লাসে যে ইতিহাস পড়ানো হতো তা মেকলে শিক্ষা পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত। আমাদের মানসিক ভাবে দুর্বল করা ছাড়া এই শিক্ষাপদ্ধতির আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। সেই উদ্দেশ্যেই তথাকথিত ভণ্ড সেকুলার ইতিহাসবিদরা মহান হিন্দু যোদ্ধা এবং সেনাপতি লচিত বরফুকনের নাম ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দিয়েছেন।

লচিত বরফুকনের পুরো নাম চাও লচিত ফুকনলুং। অহোম সাম্রাজ্যের সাহসী ও পরাক্রমী সেনাপতি ছিলেন তিনি। ১৬৭১ সালে তিনি মুষ্টিমেয় অহোম সেনা দ্বারা বিশাল মুঘলবাহিনীকে পরাজিত করে চিরকালের জন্য অহোম সাম্রাজ্য থেকে দূর করে দিয়েছিলেন-- ইতিহাসে যা সরাইঘাটের যুদ্ধ নামে পরিচিত। লচিত বরফুকনের বীরত্বের প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রতি বছর ২৪ নভেম্বর অসমে লচিত দিবস পালিত হয়। মহারাষ্ট্রের পুনেতে লচিত বরফুকনের স্ট্যাচু ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ভারতীয় সেনা অফিসারদের যখন ট্রেনিং দেওয়া হয় তখন তাদের লচিত বরফুকনের বিষয়ে জানানো হয় ও তাঁর গেরিলা যুদ্ধকৌশল সেনাদের শেখানো হয়।

লচিত বরফুকনের প্রকৃত নাম লচিত লাও। অহোম সাম্রাজ্যের মুখ্য সেনাপতি স্বরূপ বরফুকন উপাধি পান। ঘোড়ায় চড়াতে দুর্দান্ত নিপুণ ছিলেন বলে তাকে ঘোড়া বড়ুয়া উপাধি দেওয়া হয়। এছাড়া দুলীয় বড়ো বুড়িয়া, শিমুল গুড়িয়া ফুকন, দোলাকাষরীয়া ফুকন এবং রাজা চক্রধ্বজ কর্তৃক বরফুকন উপাধি পেয়েছিলেন। অহোম রাজা সুষেনফার লচিতকে উপহারস্বরূপ স্বর্ণ তরোয়াল ও পারম্পরিক বস্ত্র প্রদান করেছিলেন।

সরাইঘাটের যুদ্ধের সময় লচিত মুঘল সৈন্যদের বাধা প্রতিরোধের উদ্দেশে অহোম সেনাদের একটি উঁচু প্রাচীর তৈরি করতে নির্দেশ দেন এবং এই প্রাচীর নির্মাণের প্রধান দায়িত্বে ছিলেন তাঁর মামা। কিন্তু লচিতের মামার অলস স্বভাবের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে প্রাচীর নির্মাণের কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়। কাজ অসমাপ্ত দেখে তিনি মামার শিরশ্ছেদ করেন। মামার শিরশ্ছেদের সময় লচিতের উক্তি ছিল— 'দেশতকৈ মোমাই ডাঙর না হয়', অর্থাৎ— জন্মভূমির থেকে মামার স্থান বড়ো নয়। সরাইঘাট যুদ্ধ অহোম সেনাপতি লচিত বরফুকনের নেতৃত্বে ও মুঘল সেনাপতি রামসিংহের নেতৃত্বে গুয়াহাটিতে হয়েছিল। অহোমদের তুলনায় মুঘলদের সৈন্য সংখ্যা বেশি থাকলেও লচিতের গেরিলা কৌশলের যুদ্ধে মুঘলবাহিনী পরাজিত হয়। তখন সেনাপতি রামসিংহ লচিত বরফুকনকে বিশ্বাসঘাতক প্রমাণ করার জন্য অহোম রাজা চক্রধ্বজকে এক মিথ্যা ষড়যন্ত্রমূলক পত্র প্রেরণ করেন কিন্তু লচিতের সততা ও নিষ্ঠার প্রতি তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। ফলে মুঘল সেনাপতির মিথ্যা ষড়যন্ত্র অসফল হয়। মুঘলরা ৩০ হাজার সৈন্য, ১৫ হাজার ধনুর্ধর, ১৮ হাজার ঘোড়া, ১ হাজারের অধিক কামান ও বিশাল নৌকা নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, তুলনায় অহোম সেনারা দুর্বল হওয়ার জয় লাভের আশা ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছিল। নিজ সেনাকে পিছিয়ে যেতে দেখে লচিত বরফুকন বলেছিলেন— 'তোমরা যদি পিছিয়ে যেতে চাও, যাও । কিন্তু স্বর্গদেবতা আমাকে আদেশ করেছেন, আমি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত লড়বো, তোমরা স্বর্গদেবতাকে বলবে যে, আমি জীবনের অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত যুদ্ধ করেছি।'

লচিতের এই বাণী অহোম সেনাদের মধ্যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জাগায় ও সাহসের সঙ্গে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে মুঘল সেনাদের পরাস্ত করে এবং বহিরাগত মুঘলদের অহোম বিজয়ের স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে। □

আমার আদর্শ ও প্রেরণার উৎস ড. তুষারকান্তি ঘোষ



শ্যামল পাল

উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর থেকে মাঝে মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধুদের মুখে শুনতে পেতাম মালদা শহরের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ডক্টর তুষার কান্তি ঘোষ (মণি দা)। লোকমুখে তাঁর পাণ্ডিত্য ও ব্যবহারের বর্ণনা শোনার পর মনের মধ্যে এক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় তাঁর সঙ্গে দেখা করার। বেশ কয়েকবার বইমেলাতে তাঁর ওজস্বী বক্তব্য শুনে সমৃদ্ধ হয়েছি। তাঁর বাচনভঙ্গি আমাকে আকৃষ্ট করে। কলেজে পড়াকালীন কয়েকবার কলেজ ছাত্রদের নিয়ে কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পাই। সেখানেও তিনি ছাত্রদের মধ্যে এক আদর্শ শিক্ষক (ফ্রেন্ড, ফিলোসফার অ্যান্ড গাইড) হিসেবে পরামর্শ দিয়েছেন। তারপর দু' বছর শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার জন্য আমি চলে যাই। এমএ পাশ করে এসে কিছু সাময়িক কাজের অন্বেষণ করছিলাম। একদিন হঠাৎ জানতে পারলাম সাহাপুর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বিদ্যালয়ে আচার্যের জন্য ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। আমার ফোনে কথা হয়। তখনই মণিদার সঙ্গে আমার প্রথম ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ হয়। বাড়ি চিনতাম না, অনেক খোঁজ করতে করতে তাঁর বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হই। তখন সকাল দশটা। মণিদা আমাকে বসতে বললেন, ঘরে মা দুর্গার ছবি। চারিদিকে বইয়ের সেলফ। এই প্রথম লাইব্রেরি ছাড়া কারো বাড়িতে এত বই দেখি। মণিদা নিত্য দিনের মতো (পরবর্তীতে লক্ষ্য করেছি) স্নান সেরে প্রত্যেক ঘরে বাতি দিচ্ছিলেন এবং পড়ার ঘরে দুর্গাস্তুতি পাঠ করতে করতে মায়ের আরাধনা করেছিলেন। আমার মনে হলো তিনি সত্যিই আধ্যাত্মিক পুরুষ। এসময়ের মধ্যে আরও দুজন ছাত্র এসে উপস্থিত। আমরা গল্প করছিলাম এবং মণিদা পুজো সেরে প্লেটে করে লাড্ডু নিয়ে এসে আমাদের হাতে দিয়ে বললেন, 'গোপালের প্রসাদ'। প্রসাদ পরিবেশনের ধরন দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। যাইহোক, প্রসাদ খেতে খেতে তিনি বললেন, একটা আবেদন পত্র লিখে দে। আমি তার কথামতো আবেদনপত্রটি ইংরেজিতে লেখার চেষ্টা করলাম। (তাঁর মনের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল পত্রটি আমার বাংলাতে লেখা উচিত ছিল) আবেদনপত্রটি হাতে নিয়ে পড়ে দেখছিলেন। আমি ভয়ে ভয়ে ছিলাম কোনো ভুল লিখিনি তো! হ্যাঁ ঠিক! মণিদা দুটো ভুল বের করে আমাকে দেখালেন এবং এমনভাবে সংশোধন করে দিলেন, আমি তখনই অনুভব করলাম একজন আদর্শ শিক্ষকের শেখানোর ধরন। মণিদা আবেদনপত্রটি নিজের কাছে রেখে দিলেন এবং বললেন তুই যা আমি বিকেলে আশ্রমে যাব, দিয়ে দেব। আমাকে পরেরদিন ইন্টারভিউয়ের প্রস্তুতি নিয়ে আসতে বললেন। আমি মণিদাকে প্রণাম করলে তিনি জোরে জোরে স্তোত্র উচ্চারণ করে আশীর্বাদ করলেন — যশস্বী ভব, দীর্ঘায়ু ভব, জীবনে অনেক বড়ো হও। এই প্রথম কারো কাছ থেকে এরকম আশীর্বাদ পেলাম। আশীর্বাদ নিয়ে আমি মানসিক আনন্দ ও তৃপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

পরেরদিন সকাল ন'টার মধ্যে সাহাপুর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে গিয়ে উপস্থিত হই। বেশ কয়েকজন ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল। আমার জীবনের প্রথম ইন্টারভিউ। অতি সাধারণ ভাবে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। পাঁচজনের পর আমাকে ডাকা হলো। আমি অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করি। ঘরে প্রবেশ করার পর দেখি দুজন ব্যক্তি ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত, একজন প্যান্ট শার্ট পরিহিত এবং ভারত সেবাশ্রমের স্বামীজী গেরুয়া বস্ত্র পরিহিত। আমাকে তাঁরা বসতে বললেন। তাঁরা বেশ কতগুলো প্রশ্ন করেন। মণিদা আমাকে দুটো প্রশ্ন করেছিলেন। এক, এত অল্প বেতনে তুমি এখানে কেন পড়াতে চাও? দুই, ভারতের প্রাচীন গৌরবময় পরম্পরা সম্বন্ধে তুমি কী জানো? মনে হলো আমার দুটো প্রশ্নের উত্তরেই মণিদা-সহ সকলেই সন্তুষ্ট হলেন। পরেরদিন স্বামীজী আমাকে ফোন করে জানান, আমি যেন আগামীকালই বিদ্যালয়ে জয়েন করি। আমি প্যান্ট-শার্ট পরেই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হই। স্বামীজী আমাকে দুটো ধুতি হাতে দিয়ে বলেন এটা পরে ক্লাস নিতে হবে। আমি বাড়ি এসে প্রথম ধুতি পরা অভ্যাস করি এবং পরের দিন বাড়ি থেকে

ধুতি পাঞ্জাবি পরে বিদ্যালয়ে যাই (অন্যরা বিদ্যালয়ে এসে ধুতি পরে)। আমাকে ধুতি পঞ্জাবি পরে বিদ্যালয়ে আসতে দেখে মণিদা খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। আমাকে কাছে ডেকে বিদ্যালয়ের কাজ করতে কেমন লাগছে জিজ্ঞেস করলেন এবং তাঁর বাড়ি যাওয়ার আমন্ত্রণ করলেন। আমার ঘন ঘন মণিদার বাড়ি যাওয়া শুরু হয়। আমি জীবনে এক অন্যতম মহাপুরুষ তথা মহান ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শ পাই।

মণিদার বাড়ি যতবার গেছি যেন মণিদার কাছ থেকে নতুন কিছু শিখেছি। একদিন মণিদার শোবার ঘরে আমাকে চেয়ারে বসতে দেন। সেখানে পড়ার টেবিলের সামনে বড়ো করে বাঁধানো একটি ক্রুশবিদ্ধ যিশুখ্রিস্টের ছবি। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি মণিদা আপনার ঘরে যিশুখ্রিস্টের ছবি! উত্তরে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। একজন মহৎ ব্যক্তির কাছে এরকম চিন্তা কাম্য। আমি যখনই পড়াশোনা সংক্রান্ত কোনো সমস্যায় পড়েছি মণিদার কাছে ছুটে গেছি। সকাল, দুপুর, রাত্রি যখনই হোক হাসিমুখে সব সমস্যার সমাধান করেছেন। আমি সমাধান নিয়ে হাসিমুখে বাড়ি ফিরেছি। তিনি কখনোই খালি মুখে বাড়ি থেকে বেরোতে দিতেন না। প্রথমদিকে বাড়ি ফেরার সময় চকলেট, পরের দিকে রসকদম, লাড্ডু খাইয়ে পাঠাতেন। মণিদার আপ্যায়ন দেখে আমি মনে মনে ভাবতাম সত্যিই আগের জন্মে আমাদের কোনো আত্মিক সম্পর্ক ছিল। আমার এম ফিলের গবেষণার কাজ চলাকালীন মণিদা মানসিকভাবে অনেক সহযোগিতা করেছেন। টপিক নির্বাচন থেকে শুরু করে গবেষণাপত্র জমা দেওয়া পর্যন্ত তিনি আমার পাশে থেকে সাহায্য করেছেন। কোনোরকম স্বার্থ ছাড়াই কেউ এরকম সাহায্য করতে পারে তা আমি মণিদার মধ্যে দেখেছি। তিনি কখনো বিরক্ত হননি। তাঁর ধৈর্য দেখে আমি প্রেরণা পেয়েছি।

মণিদাকে দেখে আমারও পড়াশোনার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও আগ্রহ জন্মায়। একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক যদি এত পড়াশোনা করতে পারেন তো আমি পারবো না কেন? পড়াশোনাতে কঠোর পরিশ্রম করার ফলে আমি এসএসসি দিয়ে হাইস্কুলে জয়েন করি। এই খবর নিয়ে যখন মণিদার কাছে উপস্থিত হই, মণিদাকে প্রণাম করি, তিনি আবার আশীর্বাদ করেন এবং মুখমিষ্টি করান। আমি সেইদিনই মণিদাকে বলেছিলাম স্কুলে বেশিদিন চাকরি করতে হবে না, কলেজে হয়ে যেতে পারে। তিনি আবার আশীর্বাদ করলেন। আশীর্বাদ নিয়ে বাড়ি ফিরে আসি। এক বছরের মধ্যে আবার সিএসসি-র মাধ্যমে কলেজে চান্স পাই। কলকাতা থেকে কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গে সঙ্গে মণিদাকেও ফোন করি, মণিদা খুবই আনন্দিত হন। কলেজে সিলেক্টেড হওয়ার পর মণিদার বাড়ি গিয়ে প্রণাম করলে গলা জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করেন।

গত দীর্ঘ ছ'মাস করোনা পরিস্থিতির কারণে মণিদার সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে পারিনি। তবে অনেকবার ফোন করেও না পেলে সুভাষদার মাধ্যমে জানতে পারি মণিদা ভাগলপুরে আছেন। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি মণিদা মালদা এসেছেন। কিন্তু সেই সময় করোনার প্রভাব বাড়তে থাকায় ইচ্ছা থাকলেও মণিদার সঙ্গে দেখা করতে যাইনি। কিন্তু অনেকদিন কেটে গেলে গুরুপূর্ণিমার সমারোপ কার্যক্রমের আগে বিভাগ প্রচারক ধনেশ্বরদার সঙ্গে মণিদার বাড়ি যাই। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একগুচ্ছ বকুনি শুনতে হলো। দীর্ঘ দিন দেখা করতে আসিনি কেন? তিনি বললেন শিক্ষক দিবসে সমস্ত ছাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। হই হুল্লোড় করে আনন্দ করেছিল। শুনে আমি অবাক হলাম! এরপর আমি বলতে শুরু করলাম আমি আপনার সুরক্ষার জন্যই আপনার বাড়ি আসিনি এবং আশঙ্কা বোধ করলাম এত সবার সঙ্গে মেলামেশা করছেন কেন? উত্তরে মণিদা সরলভাবে বলে উঠলেন, তারাই তো আমার সব। এতে যা হয় হবে। এরপর কলিগ্রামের অশেষদার মৃত্যুসংবাদ দিলে মণিদা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, অশেষটাও চলে গেল। তাঁর কথায় মনে হলো তিনি একটু ভেঙে পড়েছেন। আমরা অশেষদার বাড়ি যাব শুনে তিনিও যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম আমার গাড়িতে মণিদাকে নিয়ে যাব।

চন্দনদার ইচ্ছানুসারে কলিগ্রাম যাওয়ার পরিকল্পনা হয়। যাওয়ার দুদিন আগে মণিদার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার জন্য অনেকবার ফোন করলেও ফোনে পেলাম না। বাড়ি যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম ঠিক সেসময় ধানেশ্বরদার ফোন আসে। মণিদা অসুস্থ, হসপিটালে ভর্তি করতে হবে। আমি নাড়ুকে ফোন করে মণিদার বাড়ি আসতে বলি এবং কিছুক্ষণ বাদে আমিও রওনা দিই। পরবর্তীতে ফোনে জানতে পারি মণিদা এক আদর্শ ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে করোনা পরীক্ষার জন্য সরকারি পরীক্ষা কেন্দ্রে গেছেন। আমি ও নাড়ু সেখানে উপস্থিত হই। পরীক্ষা করিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। বাড়ি নিয়ে এসে সেবা শুরু হয়। নগর সঙ্ঘচালক পীযূষদা এসে উপস্থিত হলেন। এদিকে মণিদার খুব কাছের একজন ডাক্তার পি কে দাসের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ চলছিল। তাঁর পরামর্শমতো অক্সিমিটার নিয়ে এসে অক্সিজেন মাত্রা চেক করা হলো। সেই মাত্র ৯০-এর নিচে এসে যেতে থাকে। এটা শোনার পর তাড়াতাড়ি হসপিটালে ভর্তি করার পরামর্শ দেন। ডাঃ পি কে দাসের কথামতো টোটো ডেকে আনা হয়। তাঁকে দেখে একেবারে অসুস্থ মনে হচ্ছিল না। যাওয়ার আগে তিনি নিজে নিজে বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে খাবার খেলেন। নিজের পায়ে হেঁটে হেঁটে উঠলেন। দিশারিতে নিয়ে গিয়ে অ্যাডমিশন করা হয়। আদর্শদা তাঁকে নিয়ে আইসিইউ-তে গেলেন। বিভাগ সঙ্ঘচালক সুভাষদা বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও বাড়ির কথা অমান্য করে দিশারিতে উপস্থিত হন। আমরা তাঁকে কিছুক্ষণ পরে বাড়ি চলে যেতে বলি। স্বাভাবিক হয়ে গেলে আমিও বাড়ি ফিরে আসি।

আদর্শদা নিয়মিত মণিদার সঙ্গে, বাড়ির ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। আমি নাড়ুর মাধ্যমে মণিদার খবর রাখি। করোনার প্রাথমিক পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এলেও পরেরদিন রিপোর্ট পজেটিভ আসে। মণিদাকে দিশারি থেকে মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। দিনদিন মণিদার শারীরিক অবনতি হতে থাকে। ডাক্তাররাও অনেক চেষ্টা করেও মণিদাকে আর বাঁচাতে পারলেন না। ১৯ অক্টোবর সুভাষদার মাধ্যমে জানতে পারি মণিদা আর আমাদের মধ্যে নেই। আমিও ধনেশ্বরদা সে সময় গাজোলে ছিলাম। খবর শুনে আমরা গাজোল থেকে রওনা দিই। জানতে পারি করোনা প্রটোকল মেনে সরকারিভাবে মণিদার শবদাহ করা হবে। বিকাল ৪টায় মণিদাকে নিয়ে রওনা হবে। আমরা ঠিক ৪টার মধ্যেই হসপিটালে উপস্থিত হই। কারা কারা শ্মশানে যাবে ঠিক হতে থাকে। করোনার কারণে অনেকের ইচ্ছে থাকলেও বারণ করা হলো। অবশেষে কুড়ি পঁচিশজন নিজেদের গাড়ি নিয়ে রওনা দিই। শেষ যাত্রায় সঙ্গী হতে পারে মানসিক ভাবে কিছুটা শান্তি পেলও মণিদার মতো এত বড়ো মাপের মানুষ, আমার প্রেরণাদাতা, আদর্শকে চিরতরের জন্য হারালাম। কিন্তু বিধির বিধান মেনে নিতেই হবে। মণিদার আদর্শ, জীবন পদ্ধতি, বাণী আমার প্রেরণা হয়ে থাকবে সারা জীবন।


CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

SURYA

Energising Lifestyles



Innovative **DESIGN** » World-Class Quality **PRODUCTS** » Just One Name **SURYA**



lighting



fans



appliances



pipes

SURYA ROSHNI LIMITED

E-mail: consumercare@sroshni.com I www.surya.co.in

Tel.: +91-11-47108000, 25810093-96

Toll Free No.: 1800 102 5657

/suryalighting I /surya_roshni